www.arisumu.com

পলাতকের সন্ধানে

Scanned By Arivirus

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫ অখিল মিস্ত্রি লেন,

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
১১৫ অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম কামিনী সংস্করণ ঃ
মহালয়া—১৩৯৭

©
চন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্তী

অলংকরণ ঃ
দিলীপ দাস

মূল্য—পনের টাকা

মুদ্রাকর ঃ
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

পরম কল্যাণীয়
শ্রীমান তারাশংকর মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীমান সংকর্ষণ মুখোপাধ্যায়কে
—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

www.arisumu.com

ভূমিকা

তপাইকে নিয়ে এর আগে দু'একটি নামী দামী পত্রিকায় যখন লেখা-লিখি সুরু করেছিলাম তখন অনেকেই বলেছিলেন এই দুরন্ত কিশোরকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখতে। এতদিনে সে কাজ সম্পূর্ণ হ'ল। তবুও তোমরা যারা তপাই পড়বে, তাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, এ বই পড়ে তোমরা যেন তপাই হতে যেও না। একটি ভালো ছেলে তপাই হলে তাকে ঘিরে তার মা, বাবা, আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রশাসন যে কত দুর্ভাবনায় পড়ে এ বই পড়লেই তা বুঝতে পারবে। তপাই তোমাদের অভিজ্ঞতা হোক। কিন্তু আদর্শ নয়। তোমাদের আদর্শ হবে তপাইদের ফিরিয়ে আনা।

—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

www.arisumu.com

প্রথম অধ্যায়

আমার ভাগনে তপাইয়ের কথা বলছি।

মাথার চুল উল্টিয়ে আঁচড়ানো। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। বড় সুন্দর চোখ দুটি। দেখলে একটু রাশভারি প্রকৃতির ছেলে বলেই মনে হয়। আসলে কিন্তু তা নয়। ওর সঙ্গে খুব সহজভাবে মিশলে বোঝা যায় ওর মতো মিশুকে ছেলে আর দুটি নেই। বয়স কত আর হবে? ষোলো কি সতেরো।

ছোটবেলা থেকেই তপাই খুব ডানপিটে।

মারপিট করে মারধোর খেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে সকলের মনে এমন দাগ কেটেছে ও যে আমার অন্যান্য ভাগনাদের চেয়ে তপাই-ই আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে।

বাড়ির লোকেরা অনেক চেষ্টা করেও বাগে আনতে পারেনি তাকে। ছোটবেলা থেকেই ধরে বেঁধে পড়াতে বসালে বইয়ের দিকে চেয়ে বোবা হয়ে বসে থাকত। স্কুল যাবার নাম করে রেল লাইনের ধারে বসে রেল দেখত। মাথার পোকা নড়ে উঠলে বই খাতা মুদির দোকানে দিয়ে বাদাম চানাচুর কিনে খেত। সে ছেলের পিছনে কে কতক্ষণ আর লেগে থাকবে? কাজেই অনেক বিচার বিবেচনা করে ওকে বোর্ডিং-এ দেওয়া হল। কিন্তু না। সেখানেও ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে স্যারের টাকে ঢিল ছুঁড়ে এমন কীর্তি করল যে তারাও তিতিবিরক্ত হয়ে আমাদের ছেলে আমাদের কাছেই সসম্মানে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

অতএব লেখাপড়াতেও ইতি।

ফোর ফাইভ পর্যন্ত বিদ্যে পেটে রেখেই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হল ওকে।

তারপর সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই হল।

কতকগুলো আজেবাজে ছেলের পাল্লায় পড়ে পুরোপুরি বখাটে মেরে গেল ও। তবে কি ও একটু গম্ভীর ও রাশভারি ধরনের ছেলে বলে একেবারে ছ্যাবলাটে মেরে গেল না। যা কিছু করত বেশ ডাঁটের সঙ্গেই করত।

যাইহোক। তপাই বরাবরই একটু মামা ভক্ত। তাই বাড়িতে বেধড়ক মারধোর খেলেই এবং কোথাও অঘটন কিছু ঘটিয়ে আসলেই পালিয়ে আসত ও আমার কাছে।

এ নিয়ে আমার দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকবার মনোমালিন্য হয়েছে আমার।

আসকারা দিয়ে আমিই ভাগনাটার মাথা খাচ্ছি এমন অপবাদও জুটেছে আমার কপালে। আমি অবশ্য ওসবে কিছু মনে করি না। বরং বিপথগামী এই ছেলেটিকে শোধরাবার জন্য সব রকম চেষ্টা করি এবং আমার অন্যান্য ভাগনাদের চেয়ে ওকেই একটু বেশি ভালবাসি।

হোক তপাই বাজে ছেলে। হোক সে ডানপিটে। দামাল দুরন্ত দুর্দম দস্যি—তবু ওর চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ আছে যা আমার অন্যান্য ভাগনাদের কেন অনেক আচ্ছা আচ্ছা ছেলের ভেতরেও নেই।

তপাইয়ের চরিত্রের প্রধান বিশিষ্ট্য হল সে ভয়ানক জেদি ও একরোখা। কিন্তু সে অত্যন্ত পরোপকারী। আর সবচেয়ে বড় গুণ, যে গুণটির জন্যই ওকে বড় বেশি ভালবাসি সেটি হল কারো চোখে জল দেখলে ও আর থাকতে পারে না। এইখানেই ও বড় দুর্বল। আর সেই কারণেই ওকে আমার খুব বেশি ভাল লাগে।

তপাই হল ওর অঞ্চলের পাড়ার মস্তান বা শের যা বলো তাই। ওর উৎপাতে এবং দাপটের ঠ্যালায় সবাই অস্থির।

আবার অন্য গুণও আছে।

কারো মেয়ের পয়সার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না, ডাক তপাইকে। দুরন্ত তপাই তখন সকলের কাছেই দেবতা তপাই হয়ে যায়। 'বলো বাবা তপাইয়ের চরণে সেবা লাগে, বাবাগো!' বলে এসে হাজির হয় সকলে।

তপাইও অমনি তার দলবল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তুলে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়।

কারো বাড়িতে কেউ মরেছে। গরীব দুঃখী মানুষ হয়তো। দুঃস্থ। এমন কি পোড়াতে নিয়ে যাবারও লোক নেই। ডাক তপাই বাবাকে। তপাই তো তখন তপাই নয়। বাবা তপাই। সবাই জানে সে মড়ার সদগতি তপাই করবেই করবে। চাঁদা তুলে লোকজন ডেকে অথবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে মৃতের সৎকার করে দায় উদ্ধার করে দেবে সে।

এই মড়া পোড়ানো ব্যাপারটা কেন জানি না তপাইয়ের কাছে খুবই উত্তেজনার। এতে যে কি আনন্দ পায় ও তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি নিজে মড়ার ধোঁয়া সহ্য করতে পারি না। মড়া পোড়ানো দেখতে পারি না। অথচ আমার ভাগনা তপাই বাবাজী মড়া পোড়ানোর নামে পাগল।

এ জন্যও বাড়িতে ওর লাঞ্ছনা গঞ্জনার অন্ত নেই।

সারাদিন টো টো করে ঘুরে তিন দুপুরে স্নান সেরে খেতে বসেছে এমন সময় খবর এলো মড়া পোড়াতে যেতে হবে। আর তপাইকে পায় কে? মুখের গ্রাস ফেলে রেখেই নয়তো আধপেটা খেয়েই কোমরে গামছা বেঁধে ছুটবে সে।

বেশ কিছুদিন আগের কথা বলছি।

শেষ পৌষের কনকনে এক মধ্যরাতে খবর এলো একজনকে আগুন পোয়াতে নিয়ে যেতে হবে। আগুন পোয়ানো মানে বুঝতেই পারছ, মড়া পোড়ানো।

দিদি তো শুনেই লাফিয়ে উঠলেন—খবরদার বলছি যাবি না

www.arisumu.com

তপাই।

তপাই তখন এক পায়ে খাড়া।

দিদি বললেন – তবু যাচ্ছিস ?

তপাই বলল—যাও না। লেপ চাপা দিয়ে ঘুমোওগে না। আমার ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছ কেন ?

—এই রাতে মানুষ ঘর থেকে বেরোয় ? একে দিনকাল খারাপ। যেতে হয় কাল সকালে যা।

—ততক্ষণে মড়া যে ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে সে খেয়াল আছে ? কোন দুপুরে মরেছে।

—তা এতক্ষণ কি করছিল ওরা। সারাদিনে খবর দিতে পারে নি ? যে যায় যাক। তুই যাস না। তপাই তখন প্যাণ্ট শার্ট সোয়েটার পরে কোমরে গামছা বেঁধেছে।

দিদি বললেন—তবু যাবি তুই ?

তপাই হেসে বলল—তুমি কি ভুলে গেছ মা, আমার নাম তপাই ? আমাকে বাধা দিও না।

দিদি হাল ছেড়ে দিলেন।

জামাইবাবু বিছানায় শুয়ে শুয়েই বললেন—একদিন বেঘোরে মরণ আছে ওর কপালে যা বুঝতে পারছি।

তপাই তখন রাস্তায়।

দিদি জামাইবাবুর দুশ্চিন্তার অন্য একটা কারণও অবশ্য ছিল। যে সময়কার কথা বলছি তখন সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে।

সন্ধ্যে হলেই চারিদিক থেকে দুম দাম গুলি ও বোমার আওয়াজ কানে আসত। আর শুরু হত মানুষ খুনের উৎসব। দিনমানেও খুন খারাপি হোত। তবে রাতের অন্ধকারে যা হোত তা তুলনাহীন।

ভয়ে কেউ ঘর থেকে বেরোতে পারত না। গুলি বোমার শব্দে কান রাখা যেত না।

www.arisumu.com

সেই সময় সেই প্রচণ্ড শীতের রাতে একটা ছেলে ঘর থেকে বাইরে গেলে বাপ মায়ের একটা দুশ্চিন্তা হবে বৈকী। তা সে যতই বদ ছেলে হোক।

ঘর থেকে বেরিয়ে তপাই প্রথমেই ওদের আড্ডার ঘাঁটি নসীরামের দোকানে গিয়ে ঢুকল।

নসীরামের বাড়ির বিহারের ছাপরা জেলায়। এখানে ওর একটা ধোবিখানা আছে! নসীরামের ছেলেও ওর এক সাকরেদ। এই দোকানে বসে নেশা ভাঙ সব কিছুই চলে।

তপাই এসে দেখল ডিকে আর গৌতম ওর আগেই এসে গেছে। ডিকে গৌতম তপাই আর নসীরামের ছেলে এই নিয়ে ওরা চার জন। একটা মড়াকে পোড়ানোর জন্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে চার জনই যথেষ্ট।

তপাই বলল—মালকড়ি কিছ যোগাড় হয়েছে ?

ডিকে বলল—ঐ সব করতে করতেই তো রাত হয়ে গেল।

হোক রাত। ওরা চার বন্ধুতে দোকানের এক কোণে বসে বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে মড়া পোড়াতে চলল।

ক্ষীরোদতলার গলিতে একটা ঝি বুড়ি মরেছে। কেউ কোথাও নেই তার। নাই থাক। তপাই বাবা তো আছে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো তপাইবাবা পার করে গা।

এ অঞ্চলের শ্মশান বলতে বাঁশতলার ঘাট।

শীতের সেই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় 'তার কাটা' অন্ধকার রাতে নিস্তব্ধ নিঝুম চারিদিক। শুধু রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরগুলো ছাড়া পথে কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

এত রাতে শ্মশানও নীরব।

ভ্রান্ত রাজনীতির শিকার হবার ভয়ে বিভ্রান্ত মানুষেরা রাত দুপুরে মড়া নিয়ে পোড়াতে যেতেও ভয় পেত। বাসী মড়া দাহ করার জন্য সকালে নিয়ে আসত তাই।

www.arisumu.com

কিন্তু তপাইরা ডাকাবুকো। ওদের কাছে দিন আর রাত্রি একই ব্যাপার। ওদের কারবারই আলাদা। ওদের ভয় নেই। ডর নেই। লজ্জা নেই। ঘৃণা নেই। ক্লান্তি নেই।

এদিন সকালেও তপাইরা বালিটিকুরির একটি দুঃস্থ পরিবারের মড়াকে পুড়িয়ে গেছে। তখন লাইন দিয়ে পোড়াতে হয়েছে মড়া।

এখন আবার এসেছে।

এই মধ্য রাতে শ্মশান এখন ফাঁকা।

হোক ফাঁকা। এই ফাঁকা শ্মশানেই ধুনি জ্বালাবে ওরা। জ্বলন্ত চিতার আগুনে মড়াকে শুইয়ে দিয়ে আগুনের তাপে শীতের প্রকোপ দূর করতে করতে চারজনে বসে মা শ্মাশানকালীর নাম নিয়ে বিড়ি ফুঁকবে। এ যে কি আনন্দ তা কে বুঝবে। ঘরের বিছানায় লেপের তলায় শুয়ে যারা রাত কাটায় তারা রাতের প্রকৃতির এই রূপ রস গন্ধ সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়।

এমন কি এই অনাবিল আনন্দধারার কণামাত্রও পায় না তারা।

শ্মশানের মাটিতে মড়া নামিয়ে রাতের নীরবতা ভাঙার জন্য আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তপাই—ব্যোম কালী! শ্মশানকালী, মা! আবার একটাকে নিয়ে এসেছি তোর কাছে।

যেই না বলা অমনি এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সেই নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে জনহীন শ্মশানে একটা ঝোপের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠে নাকি সুরে কে যেন বলে উঠল—এঁনেছিস বেশ করেছিস, রেঁখে দিঁয়ে যাঁ।

শুনেই তো পেটের পিলে মাথায় উঠে গেল। কে? কে বলল এই কথা! কেউ তো নেই এখানে।

তপাই গৌতম ডিকে আর নসীরামের ছেলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

চমকের ঘোর কেটে গেলে গৌতম বলল—কি ব্যাপার বলতো তপাই? কে কি যেন বলল মনে হ'ল না?

তপাই বলল—বলল মানে? স্পষ্টই তো শুনলুম।

ডিকে বলল—নেশার ঘোরে ভুল শুনলুম না তো?

নসীরামের ছেলে বলল—মোটেই না। ভুল শুনলে একজন শুনব। সবাই?

গৌতম তখন মড়াটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বেশ ভালো করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—আমার মনে হচ্ছে এই মড়াটাই বলেছে।

ডিকে বলল—তা কি করে হবে?

নসীরামের ছেলে বলল—না হবে কেন? যদি দানো পেয়ে থাকে?

তপাই বলল—তা যদি হয় তাহলে গলার স্বরটা তো এইখান থেকেই শুনতে পাবো আমরা। ঝোপের ভেতর থেকে শোনা যাবে কেন?

গৌতম বলল—ঠিক বলেছিস। কণ্ঠস্বরটা ঝোপের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এলো।

তপাই বলল—আচ্ছা দাঁড়া। আর একবার দেখি কোন উত্তর পাই কিনা। তোরা মড়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক। আমি ঝোপের দিকেই তাকাই। যদি মড়ার মুখ নড়ে তাহলে জানবি মড়াটাই বলেছে। নাহলে জানব অন্য কেউ। বলেই চেঁচিয়ে উঠল তপাই—মা, মাগো! চেয়ে দেখ মা। তোর চরণতলে আবার কাকে নিয়ে এসেছি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—এঁনেছিস বেঁশ কঁরেছিস, রেঁখে দিঁয়ে যাঁ।

শোনা মাত্রই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

ডিকে গৌতম নসীরামের ছেলে বলল—কই মড়ার ঠোঁট তো নড়ল না।

তপাই বলল—শুনতে পেলুম ঝোপের ভেতর থেকে—।

গৌতম বলল—রাত দুপুরে একি ব্যাপাররে ভাই?

ডিকে বলল—এ নিশ্চয়ই ভুতুড়ে ব্যাপার।

নসীরামের ছেলে বলল—শনি মঙ্গলবারের মড়া। এইসব মড়ার সঙ্গে একটা অন্তত মোচা দিয়ে আনতে হয়। আমরা তো তা আনিনি। ওসব নিয়ম-কানুনও মানি না। এইবারে ফল ভোগ করতে হবে তার।

ডিকে বলল—আচ্ছা, আমরা তো ভূতের গলা মনে করে ভয় পাচ্ছি। আসলে মা কালী নিজেই বলেনি তো?

গৌতম বলল—মুখ্যু। মা কালী কখনো বলে? আর মা কালী বললে অমন খনা গলায় বলবে কেন? স্পষ্টই বলবে। মন্দিরের ভেতর থেকে বলবে। ঝোপের ভেতর থেকে কেন?

তপাই বলল—এই শেষবার। আর একবার বলে দেখ দেখি কি উত্তর আসে। বলেই হাঁক পাড়ল—মা! মাগো? চেয়ে দেখ মা, রাতদুপুরে আবার কাকে এনেছি।

বলামাত্রই আবার সেই একই উত্তর ভেসে এলো ঝোপের ভেতর থেকে—এঁনেছিস বেঁশ কঁরেছিস, রেঁখে দিয়ে যাঁ।

আর এক মুহূর্ত সেখানে নয়।

চারজনেই এক লাফে লম্বা।

ওরা চারজনেই তখন পড়ি কি মরি হয়ে প্রাণপণে দৌড় লাগাল বড় রাস্তার দিকে।

রইল পড়ে ঘাটের মড়া।

আগে তো প্রাণে বাঁচো।

আগেই বলেছি তখন ছিল খুব একটা খারাপ সময়। চারিদিকে সি, আর, পি পুলিশ আর মিলিটারির কড়া নজর তখন। যেখানে সেখানে যখন তখন মানুষ খুন হচ্ছে। গোলাগুলি ছুটছে। বোমার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। ভ্রান্ত রাজনীতির উদ্‌ভ্রান্ত উল্লাসে গ্রাম শহর শিহরিত।

সেই পরিস্থিতিতে গভীর রাত্রে এইরকম একটা অঞ্চলে ওরা চারজন ভয়ের চোটে যখন খেঁচে দৌড় লাগিয়েছে তখন হঠাৎ একটা পুলিশ-ভ্যান ওদের সামনে এসে পড়ল কোথা থেকে। সঙ্গে একটি

পুলিশের জিপ।

ওদের ঐভাবে ছুটতে দেখে দারোগাবাবু জিপের ভেতর থেকে হেঁকে উঠলেন—হল্ট।

www.arisumu.com

রিভলবার উঁচিয়ে ওদের কাছে এসে বাজখাঁই গলায় বললেন—

ওরা চারজনেই নিয়ম-মাফিক দু'হাত ওপরে তুলে শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই এলাকাটা হাওড়া থানার আণ্ডারে। হাওড়া থানার দারোগাবাবু জিপে ছিলেন। জিপ থামিয়ে দারোগাবাবু জিপ থেকে নেমে রিভলবার উঁচিয়ে ওদের কাছে এসে বাজখাঁই গলায় বললেন—রাতদুপুরে এমন করে ছুটছিস কেনরে সব? কোথায় গিয়েছিলি জামাই সেজে তার কাটতে?

তপাই অতিকষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—ম-ম-মড়া পোড়াতে।

—মড়া পোড়াতে, না কোন গুদাম পোড়াতে?

গৌতম বলল—সত্যি বলছি স্যার। মা কালীর দিব্যি। এই দেখুন আমাদের কোমরে গামছা বাঁধা আছে।

দারোগাবাবু বললেন—ও দেখে কি বোঝা যায়? ওটা তো ভেকও হতে পারে তোদের।

ডিকে বলল—না স্যার! সত্যিই আমরা মড়া পোড়াতে গিয়েছিলুম।

—তাই যদি গিয়েছিলি তো এমন প্রাণের ভয়ে ছুটছিস কেন? কোন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? বদলা টদলা নিতে আসছে বুঝি?

তপাই বলল— না না স্যার। তাও নয়।

—তবে।

—ভূ-ভূ ভূত।

—ভূত! কোথায় ভূত?

—শ্মশানে।

ওদের সাজপোশাক বা কোমরে বাঁধা গামছার বহর দেখে দারোগাবাবু বুঝতে পারলেন ওরা সত্যি সত্যিই মড়া পোড়াতে এসেছিল। কাজেই রাজনৈতিক ব্যাপার যদি না হয় তাহলে কিছু একটা দেখে বেশ রীতিমতো ভয় পেয়েই যে ছুটছিল তা বোঝাই যাচ্ছে। তবু বললেন—কি বললি? ভূত!

—হ্যাঁ স্যার। ভূত।

দারোগাবাবু হেসে বললেন—হুঁ। বুঝেছি। তা একেবারে

নিরামিষ, না নেশাটেশা কিছু করেছিলি?

তপাই বলল—না না ওসব কিছু করিনি।

—ঠিক বলছিস?

—ঠিক নয়তো কি মিথ্যে?

—তা কি ব্যাপার বলতো? কোথায় ভূত? কি হয়েছে? কি দেখে এত ভয় পেয়েছিস তোরা?

তপাইরা তখন সব কথা খুলে বলল দারোগাবাবুকে।

শুনে দারোগাবাবু কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর পাকানো গোঁফজোড়ায় একবার তা দিয়ে বললেন—হুঁ। ভূতের গল্প অবশ্য ছোটবেলা থেকে অনেক শুনে আসছি। তবে চাক্ষুষ কখনো ভূত দেখি নি। তা তোদের কৃপায় আজ যদি একবার কল্পনার সেই ভূতকে দেখতে পাই তো মন্দ হয় না। দেখি কেমন ভূত।

সাহস পেয়ে তপাইরা আবার ফিরে চলল শ্মশানে। ওদেরও কি কৌতূহল কম? ওদের তো ঝোপের ভেতরে ঢুকে দেখবার সাহস ছিল না। এবার পুলিশ গিয়ে ঝোপ ঝাড় তোলপাড় করলেই ভূত তো ভূত, ভূতের বাবাও বেরিয়ে আসবে।

ওরা যখন শ্মশানে ঢুকল, খাটিয়া শুদ্ধ মড়া তখন যেমনকার তেমনিই পড়েছিল।

চারিদিক সেই একই রকম নিস্তব্ধ। নিঝুম।

এখন তো শুধু তপাইরা নয়। সঙ্গে পুলিশ আছে দারোগা আছে। পুলিশরাও তখন বন্দুক উঁচিয়ে রেডি একেবারে। বলা যায় না তো কেউ হয়তো কোন কু-কর্ম করছে। তাই ছেলে ছোকরা পেয়ে ওদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে নিজের রাস্তা পরিষ্কার করছে সে। আর যদি সত্যিই ভূত প্রেত কিছু হয় তাহলে সেও একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। ভূত দেখার সখ পুলিশেরও আছে।

শ্মশানে ঢুকেই দারোগাবাবু বললেন—কই কোথায় তোদের ভূত? যার জন্যে ভয়ে একেবারে মড়াটড়া ফেলে রেখে পালাচ্ছিলি?

তপাই বলল—ভূত তো আমরা চোখে দেখি নি।

—তবে কেন ছুটছিলি ?

—ভূতের গলা শুনেছি।

—হুম। ভূতের গলা শুনেছিস ? কই একবার আমাকে শোনা তো দেখি ?

তপাই তখন আগের মতোই চেঁচিয়ে বলল—মা, মাগো ! আজ আবার একটাকে নিয়ে এসেছি মা।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই একই উত্তর ভেসে এলো ঝোপের ভেতর থেকে—এঁনেছিস বেঁশ কঁরেছিস, রেঁখে দিঁয়ে যাঁ।

সত্যি চমকে ওঠার মতো ব্যাপার।

দারোগাবাবুর চোখ তো কপালে উঠে গেল—আরে ! তাই তো ! খনা খনা নাকি সুরে মেয়ে-ছেলের গলা এতো মিথ্যে নয়। এই পরিবেশে রাতের অন্ধকারে এই গলা শুনে ছেলেগুলো ভয়ে ছুটবে এ আর এমন কি কথা ? তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলধারী পুলিশ বাহিনীকে আদেশ দিলেন—তোমরা এক্ষুনি চারদিক থেকে ঝোপটাকে ঘিরে ফেলো। তারপর আমি দেখছি।

এই বলে টর্চ জেবলে রিভলবার হাতে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ এবং তপাইরাও গেল।

ততক্ষণে মড়ি পোড়া বামুন, খাতা লেখার লোক এমন কি ডোমটাও এসে হাজির হয়েছে পুলিশ দেখে।

কিন্তু এ কি !

ওরা ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে যা দেখল তা দেখে তো সবাই অবাক। ওরা দেখল জরাজীর্ণ অস্থিচর্মসার একটা পাগলি ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে সেই ঝোপের ভেতরে ঢুকে চিমনির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

তার মুখে টর্চের জোরালো আলো পড়তেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো সে।

দারোগাবাবু বললেন—এই তোদের ভূত !

তপাইরা অবাক্। ওদের মুখে আর কথাটি নেই। মড়ি পোড়া বামুনটা তো একটা চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে গেল পাগলিটাকে।

পাগলিটাও তাড়া খেয়ে কাঁই মাই করতে করতে খিল খিল করে হাসতে হাসতে পালাল।

দারোগাবাবু বললেন—দেখলি তো কেমন হাতে নাতে ভূত ধরলাম ? তা যাক। আর ভয় নেই। এবার যত্ন করে পুড়িয়ে দে মড়াটাকে।

তপাইরা এতক্ষণে যেন বুকে বল ফিরে পেল।

এরপর বাকি রাতটুকু ধরে মনের আনন্দে মড়াটাকে পুড়িয়ে সকালবেলা হাসতে হাসতে ঘরে ফিরল সব।

www.arisumu.com

www.arisumu.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই ঘটনার বেশ-কিছুদিন পরের কথা।

তখন শ্রাবণ মাস। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। সেদিন সকাল থেকেই আকাশ ভেঙে অঝোর ধারায় ঢল নেমেছে। সন্ধ্যের পর বৃষ্টিটা থেমে গেল যদিও তবুও আকাশের গম্ভীর মুখ দেখে আর মেঘের গুরু গম্ভীর ডাক শুনে এটুকু বোঝা গেল যে-কোন মুহূর্তে এই দুর্যোগ আবার ঘনিয়ে আসতে পারে।

তবু, এই দুর্যোগেও মড়া পোড়ানোর ডাক এলো।

ইছাপুরে এক বুড়ি সকাল থেকে মরে পড়ে রয়েছে। একটি মাত্র সাত বছরের নাতনি ছাড়া আর কেউ নেই তার। অতএব নিয়ে যেতে হবে তাকে।

তপাই আজ সারাদিন ঘর থেকে বেরোয়নি। ছোট ভাই স্বপনের স্কুল লাইব্রেরী থেকে আনা একটি ডিটেকটিভ বইয়ের পাতায় চোখ রেখে শুয়েছিল সে। এমন সময় গৌতম এসে খবরটা দিল। বলল—ডিকে আর নসীরামের ছেলে যেতে চাইছে না। শুধু তুই আর আমি। কি করবি তপাই?

তপাই শুনে বই রেখে উঠে বসল। তারপর একটা আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল—যেতে চাইছে না বললেই তো হবে না। অবশ্য তোকে ওরা না বলেছে। কিন্তু আমি গেলে দেখ কি বলে।

আমার দিদি রান্নাঘরে ছিলেন। গৌতমকে দেখেই বুঝতে পারলেন খবর খারাপ। তবু একবার জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছেরে গৌতম?

গৌতম হেসে বলল—কি আর হবে মাসীমা। আমাদের যা কাজ। সেই কাজের জন্য ডাক এসেছে আবার।

—বলিহারি তোদের কাজকে। আর কি কোন কাজ খুঁজে

পেলি না তোরা? দিন নেই রাত নেই শুধু মড়া পোড়ানো আর মড়া পোড়ানো। ঘেন্না পিত্তি বলেও কি কিছু নেই তোদের? তাছাড়া কোন্ পাপটা মলো এই কুক্ষণে?

—এখানকার নয়। ইচ্ছাপুরের।

—তা না হয় হ'ল। কিন্তু পোড়াবি কি করে? কাঠকুটো তো ভিজে জাব হয়ে আছে।

গৌতম বলল—মাসীমা। যত ভিজেই হোক, চিতার কাঠ একবার জ্বলে উঠলে তাকে নেভায় কে?

তপাই ততক্ষণে তৈরী।

দিদি বললেন—আজ তাহলে বাড়িতে খাবি না তো? তপাই বলল—না।

তপাই যা বলেছিল ঠিক তাই।

ডিকে আর নসীরামের ছেলে গৌতমকে না করে দিলেও তপাই যেতেই এক পায়ে খাড়া।

ডিকে বলল—ভাবছিলুম নাইট শো'তে একটা সিনেমা দেখব। তার জায়গায় কি আপদ।

তপাই বলল—ধ্যুৎ। সিনেমা তো আড়াই ঘণ্টার ব্যাপার। এ হচ্ছে গিয়ে সারারাতের। এই বর্ষার রাতে বুড়িকে চিতায় শুইয়ে আগুন পোয়ানোও হবে। আর একটুকু ইয়েও করা যাবে। এ সুযোগ ছাড়ে কখনো।

তপাইরা বুড়ির বাড়িতে গিয়ে বুড়ির ভাঁড়ারে যা কিছু ছিল নিয়ে তার ওপর আসপাশের বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে দু'দশ টাকা করে চাঁদা আদায় করে বুড়ির সদ্‌গতির ব্যবস্থা করে ফেলল। সব খরচ বাদ দিয়েও ওরা হিসেব করে দেখল গোটা চল্লিশেক টাকা ওদের হাতে থাকছে। সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওরা বুড়িকে নিয়ে মনের আনন্দে শ্মশানে চলল পোড়াতে।

দিনকাল খারাপ বলে তো রাত্রের দিকে মড়া পোড়ানো এ অঞ্চলে বন্ধই হতে বসেছিল। কিন্তু তপাইদের কিবা রাত কিবা

দিন।

ওরা যখন বুড়িকে নিয়ে বাঁশতলার শ্মশানে গিয়ে পৌঁছল তখন শ্মশানও খাঁ খাঁ করছিল অত রাতে। তা রাত তখন বারোটা তো বটেই।

ওরা মড়া নামিয়ে শ্মশানের লোককে ডেকে এনে খাতায় নাম লিখিয়ে কাঠকুটো যোগাড় করল প্রথমে।

তারপর ডিকে এবং নসীরামের ছেলে দুজনে দু-দিকে গেল। ডিকে গেল খাবার জিনিস আনতে আর নসীরামের ছেলে মেটে কলসী গঙ্গাজল ইত্যাদি আনতে।

শুধু তপাই আর গৌতম মড়া আগলে রয়ে গেল শ্মশানে।

শ্মশানের শ তখন জলে ভর্তি।

তপাই বলল—আয় গৌতম, দুজনে লেগে পড়ে ততক্ষণ শ থেকে জলটা পরিষ্কার করে ফেলি।

গৌতম বলল—রাখ তো। তুই যেন খুঁজে খুঁজে কাজ বার করিস।

তপাই বলল—আসলে ব্যাপার কি জানিস, চুপচাপ বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না।

গৌতম বলল—চুপ চাপ বসে থাকতে হবে না। বরং এই সময়টা একটা কিছু করা যাক।

—কি করবি ?

—এই ধর আমাদের দুজনের সাহসের পরীক্ষা।

এমন সময় শ্মশানের নিমগাছ থেকে একটা প্যাঁচা ডাকল—শ্যাঁ-স্-স্। শ্যাঁ-স্-স্। শ্যাঁ-স্-স্।

গৌতম বলল—ঐ যে প্যাঁচাটা ডাকল। ওর ডাকে তোর মনে কোন প্রতিক্রিয়া হ'ল কি ?

—না।

—আমরা এখানে দুজনে আছি তাই। ধর যদি এখানে তুই একা থাকতিস ?

—তাতে কি ? থাকতাম।

—তোর ভয় করত না ?

—না। কিসের ভয় ?

—এই ধর, ভূতের।

তপাই বেশ গম্ভীর মেজাজে বলল এবার—ভূত আবার আছে নাকি ? আর ঐ তো সেবার দেখলি ভূতের গল্প মনে করে আঁৎকে উঠে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একটা পাগলি ছাড়া কিছু নয়।

—সত্যি, তোর ভূতে ভয় নেই ? আমার কিন্তু আছে ভাই। তোরা এখানে সঙ্গে আছিস তাই, নাহলে রাত বিরেতে একা আমি ঘুম থেকে উঠে বাথরুমেও যাই না।

তপাই বলল—ধ্যুৎ। তোর দ্বারা তাহলে কিছু হবে না। ভূতের ভয় আসলে মনের ভয়। তুই বল না আমি এখুনি শ্মশানের কোণে ঐ যে নিমগাছটা আছে ঐ নিমগাছের মগ ডালে উঠে বসে থাকছি। যতক্ষণ না ডিকে আর নসীরামের ছেলে আসে ততক্ষণ একা বসে থাকব ওখানে।

গৌতম তপাইকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা ধরাল। তার পর বিড়িতে জোরে একটা টান দিয়ে আয়েস করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল—ঐ যে চিমনিটা আছে দেখছিস ?

—হ্যাঁ। দেখছি। হাসপাতালের গাদার মড়া ঐখানে পোড়ানো হয়।

—ঐ চিমনিটার ডালা সরিয়ে—ওর ভেতরে ঢুকে চুপ চাপ একা বসে থাকতে পারবি তুই ?

তপাই চিমনির দিকে তাকাল। মস্ত উঁচু চিমনিটাকে দেখলেই যেন বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। চিমনির আসপাশে বর্ষার আগাছা ও কালকাসুন্দের ঝোপ জঙ্গল। সেই ঠেলে একা ভেতরে যেতে হবে।

তপাই বলল—'এ আর এমন কথা কি ? তবে ভয় হচ্ছে সাপে

না চোটায়।'

গৌতম বলল—থাক। বুঝেছি।

—তার মানে ?

—সোজা কথাটা বল না বাবা, পারবি না। অনেক আচ্ছা আচ্ছা সাহসী লোক আমি দেখেছি।

এই কথা না শুনেই তপাইয়ের মেজাজ গেল বিগড়ে। বলল—তুই আমায় বিশ্বাস করছিস না ?

—কি করে করব ? এই একটু আগে তুই শ্মশানের কোণে জঙ্গলের মাঝে নিমগাছে উঠতে যাচ্ছিলি। আর যেই বললুম চিমনির ভেতরে ঢুকতে অমনি অজুহাত দিলি সাপের।

তপাই বলল—এই কথা ? বেশ তবে দেখ বাপ কা বেটা কাকে বলে। আমি একলাই যাবো এবং ওর ভেতরে ঢুকব।

গৌতম বলল—সত্যি ঢুকবি তুই ?

—ঢুকব। দশ টাকা বাজি।

—কুড়ি টাকা।

তপাই এক লাফে উঠে পড়ল। তারপর কোমরের গামছাটা বেশ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে সেটাকে লাঠি করে সেই ঘন অন্ধকারে জঙ্গল নাড়া দিতে দিতে ঝোপ ঝাড় ঠেলে এগিয়ে গেল চিমনির কাছে। তারপর গায়ের জোরে চিমনির নিচের লোহার ডালাটা তুলে ভেতরে ঢুকতেই দড়াম করে সশব্দে পড়ে গেল ডালাটা। তপাই দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরেও ডালাটার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না। আসলে ও ভাবতেও পারেনি অমন ধারা ঘটবে বলে। তাহলে পরের কথায় কিছুতেই এমন বিপদের ঝুঁকি নিত না। তপাই প্রাণ পণে চেষ্টা করতে লাগল ডালাটা ঠেলে ওপরে তোলবার। কিন্তু না। ওর যথা শক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হ'ল সে।

তপাই তখন অসহায় ভাবে ভেতর থেকে চিৎকার করতে লাগল—গৌতম! গৌতমরে……। শিগগির আয়। ডালাটা তোল।

কিন্তু না। ওর কোন ডাকই গৌতমের কানে পৌঁছুল না। এক তো গৌতম চিমনির কাছ থেকে দূরে বসেছিল। তার ওপর চিমনির চারিধার বন্ধ থাকায় ওর ভেতরের শব্দ এমনিতেই বাইরে এলো না। অতএব গৌতম জানতেও পারল না তপাইয়ের বিপদ কতখানি মারাত্মক হয়েছে।

অরণ্যে রোদন করাই সার হল তপাইয়ের। সে দীর্ঘক্ষণ লোহার ডালাটাকে নাড়াচাড়া করে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল এক সময়।

ওদিকে বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেলেও তপাই যখন ফিরল না তখন গৌতমও ভয় পেয়ে ডাকাডাকি শুরু করল—তপাই! চলে আয় ভাই। আর থাকতে হবে না তোকে। আমার একা একা ভয় করছে খুব।

কিন্তু কে দেবে সাড়া ?

গৌতমের শত ডাকেও কোন প্রত্যুত্তরই পাওয়া গেল না তপাইয়ের কাছ থেকে। ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাবার পর গৌতমের বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। মুখখানাও ফ্যাকাসে হয়ে গেল এক অজানা আশঙ্কায়।

তবে কি সত্যিই কোন বিপদ হল তপাইয়ের ?

ওকে কি সাপে কাটল ? না চিমনির ভিতরে গাদার মড়ার ভূত ঘাড় মটকালো ওর ? গৌতম একেই ভীতু, তার ওপর এই সব অজানা আশঙ্কার কথা চিন্তা করে হাত-পা কাঁপতে লাগল তখন।

একে এই বর্ষার ঘন ঘোর রাত।

তার ওপর বাঁশতলার নাম করা শ্মশান। কেউ কোথাও নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। আছে শুধু একটা মড়া। যে মড়াটা এখুনি ভূতে পেয়ে উঠে বসে ওর গলাটাকে টিপে ধরতে পারে।

এমন সময় হঠাৎ মনে হল গৌতমের, তপাই যখন চিমনির ভেতরে ঢুকল তখন চিমনির ভারী লোহার ডালাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়ার

শব্দটা সে শুনতে পেয়েছিল। তবে কি! তবে কি তপাই ওর ভেতরে আটকা পড়ে গেল ?

কথাটা মনে হতেই ওর সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল।

তাহলে তো এতক্ষণে দম আটকে সব শেষ।

ওকে উদ্ধার করার কোন আশাই তো এখন আর নেই।

তপাই যে ইচ্ছে করে আসছে না বা সাড়া দিচ্ছে না তা তো নয়। আসলে ও চেষ্টা করেও বেরোতে পারছে না।

গৌতম ভাবল একবার সে নিজে গিয়ে চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু সেই ভয়াবহ চিমনির আকৃতি আর অন্ধকারে ঝোপ জঙ্গলের চেহারা দেখে ভয়ে এগোতে পারল না। সে ভীতি বিহ্বল চোখে চিমনির দিকে তাকিয়ে বসে বসে ঘামতে লাগল। ইতিমধ্যে নসীরামের ছেলে ও ডিকে ফিরে এলো।

ওরা এসে তপাইকে না দেখতে পেয়ে এবং গৌতমকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বলল—কি ব্যাপাররে ? কি হয়েছে তোর ? তপা কই ?

গৌতমের মাথায় তখন একটা দুর্বুদ্ধি খেলা করে গেল। সে ভাবল সে যদি আসল সত্য প্রকাশ করে এবং ওরা সবাই মিলে চিমনির ডালা তুলে দেখে তপাইয়ের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। হয়তো খুনের দায়ে ধরা পড়বে ও। তাই সত্য গোপন করে সে নির্বিকারভাবে বলল—কি জানি। তোরা যাবার পরই আসছি বলে আমাকে বসিয়ে রেখে সেই যে গেল এখনো আসবার নাম নেই।

নসীরামের ছেলে বলল—আশ্চর্য ব্যাপার তো। এমন তো কখনো করেনা ও। তাছাড়া আমরা কি এখন গেছি ? এই রাতে এ অঞ্চলে কোথায় কি দরকার থাকতে পারে ওর, যে এত দেরি হবে ?

ডিকে বলল—এত রাতে তুই-ই বা ওকে যেতে দিলি কেন ?

গৌতম বলল—আমি কি করব ? ও কি কচি খোকা, যে ধরে রাখব ?

ডিকে বলল—আমার মনে হয় ওর কোন বিপদ হয়েছে। নাহলে এরকম করবার ছেলেই নয় ও।

গৌতম বলল—আচ্ছা ও হয়তো শ্মশানের বাইরে গিয়েছিল কোন কাজে সেই সময় ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় নি তো ?

নসীরামের ছেলে বলল—শুধু শুধু শ্মশানের বাইরেই বা যাবে কেন ও ? এই রাত দুপুরে কি দরকার ওর শ্মশানের বাইরে যাবার ? তাছাড়া বিনা দোষে পুলিশই বা ওকে ধরতে যাবে কেন ? ধরলেও ওর কোমরে গামছা বাঁধা। মড়া পোড়াতে এসেছে ও। পুলিশ ওকে ছেড়ে দিতই।

ডিকে বলল—খুবই রহস্যময় ব্যাপার! কি এমন হল ওর যে আসছি বলে বাইরে গেল আর ফিরে এলো না ?

আকাশে তখন গুর্ গুর্ করে মেঘ ডেকে উঠল।

ডিকে আর নসীরামের ছেলে তবুও একবার শ্মশানের বাইরেটা দেখে এলো। তারপর শ্মশানে এসেও চেঁচিয়ে ডাকল—তপা! এই তপা! তপাই··· ?

শ্মশানভূমি আগের মতই নীরব। সাড়া নেই শব্দ নেই। একটা মড়া খেকো কুকুর শুধু ওদের ডাকের রেশ মিলিয়ে যেতেই প্রত্যুত্তর দিল—ভৌ। ভৌ-উ-উ-উ।

ডিকে বলল—আর অপেক্ষা করা যায় না। এদিকে আকাশের অবস্থা খারাপ। আবার যদি নামে তো দয়ে মজতে হবে একেবারে।

নসীরামের ছেলে বলল—হ্যাঁ। এবার শ'য়ে চড়ানো যাক বুড়িকে। জল ছেঁচে কাঠ সাজা।

গৌতম বলল—রাত দেড়টা বাজে।

রাতের অন্ধকারে চিতা সাজিয়ে বুড়িকে চিতায় তুলে অগ্নি সংযোগ করতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা।

ডিকে আর নসীরামের ছেলে চিন্তান্বিত হয়ে বসে রইল। গৌতম মাথা হেঁট করে বসে রইল চুপচাপ। গৌতম একবার চিমনির

দিকে তাকাল। একবার চিতার আগুনের দিকে। আর একবার নসীরামের ছেলে ও ডিকের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল ওরা ওকে সন্দেহ করছে কিনা। তারপর একবার ভাবল হয়তো সময় আছে। এখনো হয়তো মরে নি তপাই। সত্যি কথাটা এবার খুলে বললে কেমন হয়? ওরা সবাই মিলে ডালাটা টেনে তুললে তপাই নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। এবং সেটা করাই হবে ওর বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু যদি বিপরীত হয়? যদি এতক্ষণে ও সত্যিই দম আটকে মরে গিয়ে থাকে তাহলে? তাহলে কি হবে? বন্ধুরাই তো ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। নিজেরা বাঁচবার জন্যে ওকেই তুলে দেবে পুলিশের হাতে। তারপর হাজত জেল ফাঁসির দড়িতে লটকানো। মনে পড়লেই সারা শরীর ঝিমঝিমিয়ে ওঠে। বিশেষ করে ডিকেটা যা বিষখোবরা ছেলে, হয়তো রাগের চোটে ওকেই এখানে শেষ করে বুড়ির সঙ্গে একই চিতায় চড়িয়ে দেবে। তাই সব কিছু ভেবে চিন্তেও চুপচাপ রইল সে। যে রহস্য অন্ধকারে রয়েছে তা অন্ধকারেই থাক। চিমনির ভেতর মরে পচে গলে শেষ হয়ে যাক তপাই। কোন প্রমাণ থাকবে না, কিছু না। শুধু একটা ছেলের নাম নিরুদ্দেশের খাতায় লেখা হয়ে থাকবে। মাসখানেক মাস দেড়েক বাদে যখন গাদার মড়া পুড়তে আসবে চিমনিতে তখন ঐ লোহার ডালা তুলে তপাইয়ের কঙ্কাল দেখে অনুমানও করতে পারবে না কেউ আজকের রাতের এই মর্মান্তিক পরিণতিকে। শুধু গৌতম জানবে আসল রহস্যটা কি। কিন্তু কাল ওর মাকে গিয়ে কি বলবে গৌতম? গৌতম নিজেই যে ওকে বাড়ি থেকে ডেকে এনেছিল।

এবার তপাইয়ের কথায় আসা যাক।

তপাই কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও হাল ছাড়ল না। সে লোহার ডালাটা প্রাণপণে তুলে ধরার অনেক চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই কিছু করতে পারল না তখন ঘর্মাক্ত কলেবরে বসে পড়ল।

উঃ। কি দুর্গন্ধ।

কি বীভৎস নরক একটা।

ওর সারা গা ঘুলিয়ে উঠল।

আলো নেই। বাতাস নেই। এখান থেকে মুক্তি পাবার কোন আশ্বাস নেই। শুধু দম আটকানো মৃত্যুর আলিঙ্গন রয়েছে এখানে। এখানে কবরের বিভীষিকা। এখানে বাঁচার জন্যে যতই হাত-পা ছোঁড়ো, যতই আর্তনাদ করো, যত জোরেই চেঁচাও, এ ডাক কেউ কোনদিন শুনতে পাবে না। শুধু ভয়ঙ্কর মৃত্যুর নির্মম কালো হাত এক সময় গলার টুঁটি টিপে ধরবে।

কিন্তু তবুও হাল ছাড়ল না তপাই। সেই আলো বাতাসহীন দুর্গন্ধময় চিমনির ভেতর বসেও ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে বাঁচবার চেষ্টা করল সে!

গাদার মড়ার চিতাভস্মে ওর সর্বাঙ্গ মাখামাখি। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাকেমুখে ঢুকে যাচ্ছে সেই ছাই। গা ঘিন ঘিন করছে। তবু উপায় কি? মৃত্যু যখন আসবে তখন মরবে। কিন্তু তার আগে বাঁচার জন্যে সব রকম চেষ্টা সে করে দেখবে।

মুক্তির উপায় খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা রাস্তা দেখতে পেল সে। ঐভাবে চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচার আশা থাকতে পারে। তাই বুদ্ধিটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সচেষ্ট হল সে। এতে যথেষ্ট বিপদ আছে যদিও তবুও এছাড়া উপায়ই বা কি? চিমনির এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল মেপে দেখল সে। তারপর একবার ওঠার জন্যে সচেষ্ট হয়েই হঠাৎ কি ভেবে চারিদিক হাতড়াতে লাগল।

গাদার মড়ার সব তো পোড়ে না। একটা অর্ধগলিত শবের হাত পেয়ে গেল তাই।

হাতটা কোমরের সঙ্গে গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল তপাই। একবার যদি কোনরকমে এর ভেতর থেকে বেরোতে পারে তাহলে বিশ্বাস-ঘাতকতার পুরস্কারটা হাতে হাতেই দিয়ে দেবে ও।

ওর সর্বাঙ্গ তখন চিতাভস্ম ও দেওয়ালের ভুষোতে মাখামাখি

হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে। এর বাইরের জগতে একবার গিয়ে পেঁছিতে পারলে সাক্ষাৎ শ্মশান ভৈরব হয়েই দেখা দেবে সে।

এই ভেবে ভগবানকে স্মরণ করে চিমনির এক দেওয়ালে পিঠ এবং অপর দেওয়ালে পা দিয়ে একটু একটু করে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল সে।

প্রথম দিকে ওঠার সময় দু'একবার হড়কে নেমে এলেও বার বার চেষ্টার পর এক সময় সে বহু কষ্টে ওপরে উঠে পড়ল।

আর ভয় নেই। আচমকা বজ্রাঘাতে যদি মৃত্যু না হয় তো চিমনির জঠর থেকে, নরকের দুর্গন্ধ থেকে বেরিয়ে আসার পর মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত সে হতে পেরেছে। আঃ। কি নির্মল বাতাস। বাইরের জগতের আলো বাতাস যে এত সুন্দর হয় তা এই প্রথম অনুভব করল তপাই। ভেতরের ঐ দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে সে যেন নবজীবন লাভ করল। বাইরে তখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

সেই বৃষ্টিতে ওর গায়ের ভুষো কালি ছাই মাখামাখি হয়ে চ্যাট চ্যাট করতে লাগল।

চিমনির মাথায় বসে তপাই একবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল চিতার আগুন জ্বলছে এবং ওরা তিনজনে নীরবে বসে আছে।

তপাই বুঝতে পারল গৌতম ব্যাপারটা একদম চেপে গেছে ওদের কাছে। ভয়ে কিছু বলে নি। বললে ওরা কখনোই ঐভাবে চুপচাপ বসে থাকত না। একটা কিছু ব্যবস্থা অন্তত করত।

তপাইয়ের মুখ থেকে অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এলো 'ব্যাটা বেইমান'। রাগে ওর সারা শরীর রী রী করতে লাগল। মাথাটা যেন জ্বলে উঠল প্রতিহিংসা নেবার উল্লাসে।

এবার ও নিচে নামার চেষ্টা করল।

বাইরের দিক থেকে নিচে নামাটা অবশ্য কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। নিচ থেকে একদম ওপর পর্যন্ত একটা লোহার সরু মই চিমনির দেওয়ালে আঁটা আছে।

তপাই সেই মই বেয়েই তর তর করে নেমে পড়ল নিচে।

নিচে নেমেও তপাই কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেল না। এখন সর্বাগ্রে যা করতে হবে তা হ'ল প্রতিশোধ নেওয়া।

অচৈতন্য গৌতমকে পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে নিয়ে আসছে

www.arisumu.com

শ্মশানের পাঁচিলের কাছে একটা চৌবাচ্চা আছে। সেখান থেকে জল নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা চিতায় ঢালে। তপাই করল কি সেই চৌবাচ্চার ধারে ঘন অন্ধকারে কতকগুলো ঘেঁটু ও মানগাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল চুপ করে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা কামড়াল

ওকে। পায়ের ওপর দিয়ে টিকটিকি চলে গেল। ও কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করল না সেদিকে। হোক কষ্ট। তবু ও বদলা নিতে ছাড়বে না। এমন ভয় দেখাবে যে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে বাছাধনের।

যথাসময়ে মড়া পোড়ানো শেষ হ'ল। এবার জল ঢালার পালা।

তিনজনেই এগিয়ে এলো কলসি নিয়ে।

প্রথমে ডিকে। পরে নসীরামের ছেলে। তারপর গৌতম।

গৌতম ভয়ে ভয়ে এসে চৌবাচ্চায় নামার আগে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল চিমনিটার দিকে। কি ভাবল সে কি জানে? তারপর যেই না কলসিটা জলে ডোবাতে যাবে অমনি তপাই কোমরের সঙ্গে গামছায় বেঁধে আনা সেই দুর্গন্ধযুক্ত আধ-পচা মড়ার হাতটা ওর পিঠের ওপর রেখে দিল।

যেই না দেওয়া অমনি সেই হিম শীতল দুর্গন্ধময় মৃত হাতের পরশে শিউরে উঠল গৌতম। তারপর চমকে উঠে মুখ তুলেই কালি ঝুলি মাখা একটা কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে গেঙিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

গৌতমের গোঙানিতে ডিকে আর নসীরামের ছেলে ছুটে এলো। ওরা এসে যা দেখল তা আরো ভয়ংকর। ভয়ে ওদেরও হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে গেল। প্রেত কি পিশাচ কিছুই বুঝতে পারল না ওরা। দুজনে হাঁ করে চেয়ে বোবা হয়ে গেল।

ওরা দেখল রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর একটা কিছু অচৈতন্য গৌতমকে পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে নিয়ে আসছে চৌবাচ্চা থেকে।

নসীরামের ছেলে সভয়ে জড়িয়ে ধরল ডিকেকে। ডিকেও জাপটে ধরল নসীরামের ছেলেকে। জড়াজড়ি করে ধরে থাকলেও ওদের মনে হল এখুনি বুঝি পড়ে যাবে ওরা।

গৌতমকে উপরে উঠিয়ে প্রেতটা বলল—ভয় নেইরে। আমি তপাই। বিশ্বাসঘাতকটার বদলা নিলাম।

এ তো তপাই।

এ গলা তো ওদের বহু পরিচিত।

ডিকে আর নসীরামের ছেলে আবাক হয়ে বলল—তপাই তুই!

—হ্যাঁ আমি।

—তোর এ রকম অবস্থা হ'ল কি করে?

—এই বিশ্বাসঘাতকটা বেইমানি করে আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। নেহাৎ ভগবানের দয়ায় আর নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় এ যাত্রা বেঁচে গেছি আমি।

ডিকে বলল—আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—এখন বোঝাবুঝির সময় নয়। ওর মুখে চোখে জল দে। তারপর গঙ্গায় গিয়ে স্নান করি চল। কাল সকালে সব বলব।

ওরা কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তপাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

www.arisumu.com

তৃতীয় অধ্যায়

এই ঘটনার পর থেকে তপাই আর মড়া পোড়াতে যায় নি। ওর বন্ধুরাও দল ছুট হয়ে গেল তাই। নসীরামের ছেলে তার বাবার ধোবিখানা দেখা শোনা করতে লাগল। গৌতম পাড়ায় একটা চায়ের দোকান দিল। ডিকে ভিড়ে গেল সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকারদের দলে। আর তপাই ? একদম চুপ চাপ।

মড়া পোড়ানোর মতো অপকর্মটা যে ওর মাথা থেকে নেমেছে এই দেখে ওর বাবা মা খুব খুশি। তপাই দিব্যি খায় দায় ঘুরে বেড়ায় সিনেমা দেখে। আর পাড়ায় মস্তানি করে। ইদানিং লবা নামে ওর এক সঙ্গী জুটেছে। লবার ভালো নাম নবনী থেকে নব। আর নব থেকে লবা। লবা নতুন ড্রাইভারী শিখেছে। এখনো লাইসেন্স পায় নি। তাই জটুদার গ্যারেজে দিন রাত হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। জটুদা পাকা ট্যাক্সি ড্রাইভার। লবাকে স্টিয়ারিং ধরতে সেই শিখিয়েছে। লাইসেন্স বার করার দায়িত্বও তার।

সেদিন দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে পান চিবোতে চিবোতে তপাই জটুদার গ্যারেজে যেতেই লবা বলল—তপাই তারকেশ্বর যাবি ? বাবার মাথায় জল দিতে ?

তপাই প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠল—নিশ্চয়ই। কিন্তু কি করে যাবো ?

লবা চোখ কপালে তুলে বলল—কি করে যাবি মানে ? যে ভাবে সবাই যায় সেই ভাবেই যাবি। অর্থাৎ এখান থেকে বাসে চেপে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেণে শ্যাওড়াফুলি। শ্যাওড়াফুলি থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে ব্যোম্ ব্যোম্ তারক ব্যোম্ করতে করতে তারকেশ্বর।

তপাই হেসে বলল—তুই তো বেশ মুখস্ত নামতার মতো গড়

গড় করে বলে গেলি। কিন্তু মাল কড়ি আসবে কোত্থেকে ? পকেট তো গড়ের মাঠ। বলি টাকা পয়সা চাই না ?

—তা তো চাই। তবে তুই মন করলে টাকার অভাব ? তোলা তোল।

—না। এই সেদিন চাঁদা তুলে বামুন পাড়ার একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। আবার চাঁদা চাইতে গেলে মারতে আসবে লোকে।

—তোকে !

—হয়তো মুখে কিছুই বলবে না। কিন্তু এই সব ঝুট মুট ব্যাপারে চাঁদা তুলতে থাকলে আসল কাজের সময় কিন্তু চাঁদা চেয়েও পাবো না আর। কাজেই ও ব্যাপারে আমি নেই ভাই।

—তবে তো যাওয়াই হ'ল না। জটুদারও ছেলের অসুখ বলে দেশে গেছে। নাহলে জটুদার কাছেই চাইতাম।

তপাই অনেকক্ষণ ধরে গালে হাত দিয়ে চুপ চাপ বসে কি যেন ভাবল। তারপর বলল—দেখ, আমাদের রজনী খুড়ো কিন্তু দিলদার লোক। একবার গিয়ে দেখব খুড়োর কাছে ? যদি কিছু টাকা ধার দেয় আমাদের !

—রজনী খুড়ো ! মানে গৌতমের জ্যাঠামশাই ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু গৌতমের সঙ্গে তোর সেই ব্যাপারটার পর থেকে যে কথাবার্তা নেই শুনেছিলুম ?

—কে বলল ! আসলে সেটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। আমি কথাবার্তাও বলি, ওর দোকানে বসে মাঝে মধ্যে আড্ডাও দিই। তবে কিনা আমাদের মড়া পোড়াতে যাওয়ার উৎসাহটা মরে গেছে।

লবা বলল—তাহলে একবার চল না গিয়েই দেখি খুড়োর কাছে।

—চল তবে।

ওরা দুজনে তখন গুটি গুটি গিয়ে হাজির হ'ল খুড়োর

ওখানে।

খুড়ো তখন টালির ঘরের দালানে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ভুর ভুর করে গড় গড়ার নলে টান দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। এমন সময় তপাইদের দেখে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন—কে র‍্যা!

—আমি তপাই। আর এ হচ্ছে লবা।

—অ। তপা! তোকে চিনি। কিন্তু ওটাকে তো চিনলুম না।

—ও আমার নতুন দোস্ত।

—বেশ বেশ। তা কি মনে করে?

তপাই আবদার করে বলল—খুড়ো একটা কথা বলব? তোমার তো অনেক টাকা। গোটা পঞ্চাশেক টাকা আমাদের ধার দেবে?

—শোধ করবি কোত্থেকে? তার কেটে?

—কি যে বলো খুড়ো। শোধ তোমাকে ঠিক করে দেবো। আমার নাম তপাই। তুমি তো চেন আমাকে।

খুড়ো হেসে বলল—টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারে আজকাল কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না। যাকে ধার দিই সে তো ধার শোধ করেই না উপরন্তু আবার এসে ধার চায়। তবে তুই যখন বলছিস···।

—বাবার দিব্যি। বাবা তারকনাথের দিব্যি। আমরা দুজনে বাবার মাথায় জল ঢালতে যাবো তাই টাকার দরকার। আসলে বামুনপাড়ার একটা মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে পকেট একদম খালি হয়ে গেছে।

খুড়ো এবার শিরদাঁড়া সোজা করে বসে বলল—শোন, পরের উপকার করা খুব ভালো। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে নিজেদের একেবারে ফতুর করিস না বুঝলি? ঠিক আছে। পঞ্চাশ টাকা কেন তোদের আমি একশো টাকা দেবো। আমার একটা কাজ করে দিবি তোরা?

—কি কাজ বলো? কাউকে ধরে পিটিয়ে দিতে হবে? এখুনি

দিচ্ছি।

—আরে না না। ওসব নয়। কাছে আয়, কানে কানে বলি।

তপাই খুড়োর দিকে ঝুঁকে আসতেই খুড়ো ফিস ফিস করে বলল—তোরা তো এত লোকের বে দিচ্ছিস। এবার আমার একটা বে দে দিকিনি।

তপাই তো এক লাফে লম্বা—বলো কি খুড়ো! তুমি বিয়ে করবে? রসিকতা করছ না তো?

—রসিকতা নয় রে, রসিকতা নয়। সত্যি সত্যিই বলছি। আমার এত টাকা খাবে কে? ভাইপো ভাইঝিরা কেউ দেখছে না। সব সময় দিন নেই ক্ষণ নেই শুধু টাকা দাও, টাকা দাও। দিলে ভালো না দিলেই মন্দ। টাকা নিলে ফেরৎ তো দেয়ই না উপরন্তু এখন দিই না বলে কেউ দেখেও না। ওরা শুধু দিন গুণছে কবে আমি মরব। আমি মরলেই ওদের পোয়া বারো। সব টাকা ওদের হয়ে যাবে। তাই আমি ঠিক করেছি আমার এক পয়সাও যাতে ওরা না পায় সেই ব্যবস্থা করে যাবো! আর সে ব্যবস্থা করতে গেলে এই বুড়ো বয়সে একটা বে না করা ছাড়া উপায় নেই।

—কিন্তু খুড়ো, এই বয়সে বিয়ে করে পাড়ায় তুমি মুখ দেখাতে পারবে?

—ক্যানো পারবুনি? কার খাই পড়ি?

—তা তো বটেই। কিন্তু খুড়ো তোমার বয়সটা?

—বয়েস বেশি নয়। আমাকে যতটা বুড়ো দেখায় ততটা আমি নই। এখন আমার বাহাত্তর বছর বয়েস। আমি লব্বুই বছর বাঁচব।

—তুমি শতায়ু হও খুড়ো। তবু আমি বলি কি বিয়ে করে তুমি গ্রামের দিকে চলে যাও। কিছু পুকুর বাগান কিনে ভোগ দখল করো। নাহলে এখানে থাকলে নানা লোকে নানা কথা বলবে। কেউ টিটকিরি মারবে। হাসাহাসি করবে। বরং গ্রামের দিকে থাকলে তোমার শরীর মন মেজাজ সবই ভালো থাকবে।

খুড়ো শুনেই ফোঁস করে উঠল—কি বললি ? টিটকিরি মারবে ? কে ! কে মারবে ? তাহলে জেনে রাখ, তোরা কি মস্তান। তোদের থেকেও ঢের বেশি মস্তান আমি। এই বুড়ো হাড়েও আমি স্ট্যাব করতে পারি। হাজত বাসের ভয়ও আমার নেই। কদিন হাজতে রাখবে আমাকে ? আমায় তো সকালে ঢোকোলে বিকেলে মরব। আমার সঙ্গে লাগলে কেটে চ্যালা করে ফেলব না একেবারে। যদি পারিস তো ব্যবস্থা কর। পাড়াশুদ্ধ লোককে আমি নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো কথা দিলুম। আমার আত্মীয় স্বজনদের মুখে যদি আমি ছাই না দিই তো কি কথাই বলেছি। তবে কাজটা হবে খুব চুপি চুপি।

তপাই বলল—সে কথা আবার বলতে ? আমি এক মাসের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

—কর। যদি আমার জন্যে সত্যিই কিছু করতে পারিস তাহলে তোকে আমি এক হাজার টাকা দেবো। ঐ টাকা নিয়ে ব্যবসা করবি তুই।

তপাই উল্লসিত হয়ে বলল—ঠিক দেবে তো খুড়ো ?

—অবিশ্বাস হচ্ছে ? দেখবি আমার কত টাকা ? দেখ। বলে ঘরে ঢুকে ঘরের কোণে—এগিয়ে গেল। তারপর ময়লা কাপড় ঢাকা টেবিলের মতো একটা জায়গার ওপর থেকে ছেঁড়া বই পত্তরের গোটা কতক গোছ নামিয়ে কাপড়টা সরাল। কাপড়টা সরাতেই বোঝা গেল সেটা একটা সিন্দুক। খুড়ো কোমরের কসি থেকে চাবি বার করে সিন্দুক খুলতেই দেখা গেল বেশ কয়েকটা পাঁচ দশ টাকার বাণ্ডিল শোভা পাচ্ছে সেখানে।

তপাই আর লবা হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

খুড়ো বলল—দেখলি তো ? আরো আছে। এর একশো গুণ। সে সব পোস্ট অফিসে জমা আছে। কাজেই মিথ্যে কথা আমি বলছি না। এই বলে দশ টাকার দশটা নোট বার করে তপাইয়ের হাতে দিয়ে খুড়ো বলল—যা। বাবার মাথায় জল ঢেলে আয়।

তবে আমার কথাটাও মনে রাখিস কিন্তু। তোর এই বন্ধুর সামনেই বলে রাখলুম, এক হাজার টাকা তোকে আমি দেবো।

টাকা নিয়ে তপাই আর লবা তো প্রায় নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পৌনে দুটো। রইল এখন বাবার মাথায় জল ঢালা। নবরূপমে 'পকেটমার' হচ্ছে। দেবানন্দের বই। ছোট্ ছোট্। ডিকে তো আছেই। তার ওপর পকেট ভর্তি টাকা। কাজেই টিকিটের আর ভাবনা কি ?

সন্ধ্যের সময় আমি অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি তপাই আর লবা বসে আছে। ওদের পুলকিত মুখ দুটি দেখেই বুঝলাম কিছু একটা আনন্দ সংবাদ আছে নিশ্চয়ই। যাই হোক, আমি বাথরুম থেকে ফ্রেস হয়ে এসে বললাম—কি খবর তপাই ?

—খবর আছে মামা। খবর আছে। আগে চা রুটি খান, তারপর বলছি। এখন আপনার ওপরই আমাদের সব কিছু নির্ভর করছে।

—আমার ওপর !

—হ্যাঁ। আমাদের পাড়ার এক বাহাত্তর বছরের বুড়োর বিয়ে হবে। এবং সে বিয়ে আমাদেরকেই দিতে হবে। অতএব আপনার সাহায্য চাই।

শুনেই তো চোখ কপালে উঠে গেল আমার—বলিস কিরে !

লবা তো হেসে গড়িয়ে পড়ল।

আমি আমার ঘরে ঢুকে তক্তাপোশে গুছিয়ে বসে বললাম—কি তামাশা করছিসরে ভর সন্ধ্যেবেলা।

—তামাশা নয় মামা তামাশা নয়। সত্যি সত্যিই। আপনাকে বরকর্তা হতে হবে। বরযাত্রী যেতে হবে। বলে আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল তপাই।

—কিন্তু কনে ? কনে কোথায় পাবি ?

—সেই জন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এসেছি মামা। তবে

একান্ত না পাওয়া যায় আমাদের বন্ধু বান্ধবের ভেতর থেকেই কাউকে সাজিয়ে নিয়ে ঝামেলাটা চুকিয়ে দেবো।

—সে কি!

—তাছাড়া?

—বাহাত্তর বছরের বুড়োর বিয়ে ছেলেদের সঙ্গে হবে না তো কাদের সঙ্গে হবে বলুন?

আমি একবার ঘাড় মাথা চুলকে নিয়ে বাইরে এসে পায়চারি করে বললাম—দেখ ব্যাপারটাকে তোরা হয়তো খুব মজা হিসেবে নিয়েছিস। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু এটাকে ঠিক সেইভাবে নিতে পারছি না। যে মানুষটা সারা জীবন বিয়ে থা না করে কাটিয়ে দিল আজ এই বুড়ো বয়সে কেন সে বিয়ের কথা চিন্তা করছে তা একবার ভেবে দেখেছিস? যে কোন মানুষেরই বৃদ্ধ বয়সে একা থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আদর যত্ন সেবা শুশ্রূষা খুবই কষ্টকর হয়েদাঁড়ায়। রাত-বিরেত প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ওঠা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর জন্যে প্রতিনিয়ত একজন মানুষের সাহায্যের খুবই দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সুস্থ সবল মানুষেরা ঐসব অসহায় মানুষদের কষ্টের কথা একবারও চিন্তা করে দেখি না। কাজেই সত্য সত্যই বুড়োর জন্যে এখন এমন একজনকে দরকার যে সেই সব দিকগুলো বিবেচনা করে বুড়োকে দেখা শোনা করবে। অন্য দেখা শোনার লোক রাখলে তারা টাকার লোভে মেরেই ফেলবে বুড়োকে। কিন্তু বুড়োর হয়তো বিয়ে করা বউ তো তা পারবে না। অতএব কোনরকম ফাজলামি নয়। বিয়ে দিতেই হবে বুড়োর। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিছু কি করা যাবে?

—করতেই হবে মামা। দেখুন না, আপনাদের অফিস টফিসে সে রকম কেউ নেই!

আমি লাফিয়ে উঠলাম—ওরে বাবা। ওসব অফিসের ব্যাপার নয়। দুস্থ দরিদ্র অনাথা এবং অসহায় গোছের কারো খোঁজ করে

দেখতে হবে।

—সেরকম কেউ আছে?

—এখুনি বলি কি করে!

—একটু চেষ্টা করে দেখুন না মামা। কেননা এই বিয়েটা দেওয়াতে পারলে এক হাজার টাকা পাব আমি।

—ঠিক আছে। তোরা নিজেরা এ ব্যাপারে আর এগোস না। আমিই ব্যবস্থা করছি। কাল বিকেলে বাড়ি থাকিস। আশা করি উপায় একটা বাৎলে দিতে পারব।

তপাই আর ল্বা চলে গেল।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে এই রকম একজনের খোঁজ আমার জানা ছিল। স্বামী পুত্র হীনা। কেউ কোথাও নেই তার। কিছুদিন আগে আমাদের বাড়ি এসেছিল এখানে থাকা খাওয়ার বিনিময়ে কাজকর্ম করবে বলে। কিন্তু আমাদের একটা অসুবিধা থাকায় আমরা রাজি হইনি। এখন হঠাৎ তার মুখটা মনে পড়ে গেল। দুটো পেট ভরে খাবার জন্যে সে কি কান্না তার। তাই ভাবলাম সকালে অফিস না গিয়ে সরাসরি তার ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললে বুড়োরও উপকার হবে এবং সে বেচারিও বর্তে যাবে। আর বুড়োর যে রকম টাকা পয়সার কথা শুনলুম তাতে বুড়ো মরে গেলেও অসুবিধে হবে না তার।

এই ভেবে পরদিন সকালেই আমি সাঁকরাইলে চলে গেলাম। তারপর অনেক বুঝিয়ে বাঝিয়ে রাজি করালাম তাকে। একজনের টাকা ব্যাঙ্কে পচবে। পাঁচ ভূতে খাবে। আর একজন ক্ষুধার জ্বালায় তিল তিল করে মরবে এ তো হতে দেওয়া যায় না। কাজেই ব্যবস্থা একটা করতেই হয়।

অতএব ব্যবস্থা করে সোজা চলে এলাম কদমতলায় দিদির বাড়ি।

দিদি জামাইবাবু দুজনেই লাফিয়ে উঠলেন আমার কথা

শুনে—বলিস কিরে! রাজি হ'ল?

—না হবার কি আছে?

জামাইবাবু বললেন—যেমন ভাগনা তেমন মামা তো। তা আমরাও নেমন্তন্ন পাচ্ছি তো এ বিয়েতে?

—শুধু আপনারা কেন পাড়া শুদ্ধু লোক সবাই নেমন্তন্ন পাবে।

তপাই বলল—তাহলে মামু, এবার উঠে পড়ে লাগা যাক। চলুন আমরা খুড়োর ওখানে যাই।

তপাইয়ের সঙ্গে আমি খুড়োর ওখানে যেতে খুড়ো তো দারুণ খুসি। বলল—তপা! মামাবাবু যখন এসেছেন তখন মামাবাবুর জন্যে কিছু মিষ্টি আনতে হয় যে। যা মোড়ের দোকান থেকে দশ টাকার রাজভোগ নিয়ে আয়। ঐ বালিশের তলায় টাকা আছে। নিয়ে যা।

তপাই চলে গেলে আমি বললাম—খুড়ো, আপনার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ হচ্ছে আমার। পরে অবশ্য আরো আসব যাবো। তবে—

—এর ভেতরে কোন তবে টবে নেই। আমার সব দায় দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে মামা। এরা নেহাৎই ছেলেমানুষ।

—কিন্তু আমার ভাগনাকে যেটা দেবেন বলেছিলেন সেটা ঠিক দেবেন তো?

—ওমা! সে কি কথা। ভদ্দরলোকের ছেলে কখনো কথার খেলাপ করতে পারি? বে'র দিন সকালেই আমি দিয়ে দেবো।

—ঠিক আছে।

—তবে আমি কিন্তু মামা সব আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম। এ পাড়ার কোন লোক যেন নেমতন্ন থেকে বাদ না যায়। সবাইকে দম ভোর খাওয়াবো। আমার তো দিন শেষ। কি করব মামা অত টাকা আগলে রেখে? তাই ভাবছি এই উপলক্ষ্যে পাড়ার লোকগুলোকে একটু আনন্দ করে খাইয়েই দিই। বুড়ো বয়সে বে

থা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম এছাড়া আমার উপায়ও নেই। যে আমার দেখা শোনা করবে সেই পাবে আমার সম্পত্তি টাকা পয়সা। অথচ এই সবের লোভ দেখিয়ে কাউকে এনে রাখতেও সাহস হয়নি আমার। যদি কেউ রাত্তিরবেলা দম আটকিয়ে মেরে দেয়? আর বউ তো তা পারবে না। আমার ভাইপোরা এই বার জব্দ হবে। ওরা ভেবেছিল আমি মরলেই লুটে পুটে খাবে সব। কিন্তু সেটি হচ্ছে না। দুঃখের কথা কি বলব মামা জ্বর হলে একটু ওষুধ এনে দেয় না। টাকা ভাঙিয়ে কিছু আনতে দিলে ভাঙানি ফেরৎ দেয় না। সেদিন রাত্তিরবেলা কি দারুণ পিপাসা পেয়েছিল। জল জল করে মরে গেলুম তা আমার মুখে কেউ একটু জল দিলে না মামা। টাকা পয়সা চাইলে যদি ধার না দিই তো বলে কিনা আমার পোস্ট অফিসের বই কাগজ পত্তর সব পুড়িয়ে দেবে।

আমি নীরবে সব শুনলাম। তারপর বললাম—ওসব ব্যাপার নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আপনি যা করতে চলেছেন এই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। এবার দেখবেন পাড়ায় আর মুখ দেখাতে পারবে না আপনার ভাইপোরা। লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। গায়ে থুতু দেবে।

আমার কথা শুনে বুড়ো তো বেজায় খুশি। একটু পরেই তপাই রাজভোগ নিয়ে এলে মনের আনন্দে মিষ্টি মুখ করলাম। তারপর সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে চলে এলাম বাড়িতে।

কয়েকদিনের চেষ্টায় সব ব্যবস্হাই পাকা হয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা সবাই সপরিবারে নিমন্ত্রিত হলেন। আমার জামাইবাবু নীলমণি বাঁড়ুজ্যে এসব ব্যাপারে খুব পাকা লোক। তিনিই সমস্ত কিছু কেনা কাটা, হালুইকর ডাকা, ভালো মন্দ কি কি খাওয়া যায় সে সবের ব্যবস্হা করতে লাগলেন।

রজনী খুড়োর এই বিয়ের ব্যাপারটা মজার হলেও নেমন্তন্ন পেয়ে পাড়ার লোকেরা সবাই খুশি হল খুব। অফিস কামাই করেই কাজে

লেগে গেল অনেকে। বুড়োর আত্মীয় স্বজনরা লজ্জায় মুখ ঢাকতে দেশে পালাল।

বিয়ের দিন বরযাত্রী যাবার জন্যে চ্যাংড়াও জুটল প্রায় ডজন খানেক। সেই দেখে আমরা বড়রা তো সবাই গা ঢাকা দিলাম। দাদু দিদিমার বিয়েতে নাতিরাই আনন্দ করুক।

জটুদার গ্যারাজ থেকে জটুদার ভাড়া খাটা ট্যাক্সিটা ম্যানেজ করে নিয়ে এলো লবা। সেই গাড়ি সাজানো হল ফুল দিয়ে! পুরুতের কাজটা আমার বড় ভাগনা শংকরই করে দিল বই দেখে। তারপর কোন এক অশুভক্ষণে বরের গাড়ি নিয়ে রওনা হল ওরা।

অশুভক্ষণে বলছি এই কারণে যে ঐ আনন্দের মাঝেও বিষাদের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। আমরা বড়রা কেউ সঙ্গে থাকলে অতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। আসলে ছেলেগুলো চ্যাংড়া, তার ওপর জটুদা থাকায় এবং এ বিয়ে তো অন্য বিয়ের মতো নয় কাজেই উৎসাহিত না হয়ে বরযাত্রীর ব্যাপারটা আমরা এড়িয়ে যাওয়ায় অঘটনটা খুব সহজেই ঘটে গেল।

বুড়োকে নিয়ে একটি ট্যাক্সিতে কেটে ছেঁটে দশজন উঠেছিল। প্রত্যেকটাই চ্যাংড়া দি গ্রেট। কিছুদূর যাবার পরই জটুদার একটু গলা ভেজাবার দরকার হয়ে পড়ে। তাই একজায়গায় ট্যাক্সি থামিয়ে সুরু হয় গলা ভেজানোর পালা। বুড়ো নিজেও বাদ যায় না। আর সব কিছু তো তারই পয়সায় হচ্ছে। জটুদার মতো মাতাল পরের পয়সায় নেশা করতে পেলে ছাড়বে কেন? তপাইরাও বাদ গেল না। এই করতে করতে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে কারো আর হুঁশ্যিদিগ্যি নেই। ঘোর একটু কাটলে এক সময় তপাই আর লবা ধরাধরি করে সবাইকে ট্যাক্সিতে ঢুকিয়ে নিজেরাও উঠে বসল। জটুদার তো একদম সাড়া শব্দ নেই। লবা বলল—কুছ পরোয়া নেই। স্টিয়ারিং আমিই ধরছি।

তপাই বলল লবা, তুই কিন্তু বলেছিলি আমাকে গাড়ি চালানো শেখাবি। ফাঁকা রাস্তা। কেউ কোথাও নেই কিন্তু।

এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হতেই পারে না। দিবি শিখিয়ে?

লবা বলল—ও ইয়েস। এখন না দিলে দেবো কখন। নে ধর। স্টিয়ারিং ধর।

তপাই স্টিয়ারিং ধরল।

—নে এবার এইখানটায় টেপ।

—টিপেছি।

— এইখানে চাপ দে।

—এই তো—এই তো গাড়ি চলছে।

— সবে তো সুরু। গাড়ি এবার উড়বে। আরো জোরে চাপ দে।

—কিন্তু গাড়িটা রাস্তা থেকে নেমে যাচ্ছে যে।

—যেতে দে না। অত ভয় পেলে ড্রাইভারি শেখা যায় না। সময় হলেই ও আবার রাস্তায় উঠে পড়বে'খন।

কিন্তু না। গাড়ি আর রাস্তায় উঠল না। সোজা খাদের ধারে একটা পানাপুকুরে গিয়ে পড়ল।

ভাগ্যিস কিছু লোকের নজরে পড়েছিল তাই। সবাই হৈ হৈ করে ছুটে গিয়ে যখন উদ্ধার করল ওদের তখন ভয়ানক ব্যাপার। তপাই লবা এবং আরো তিনজনকে আশংকা জনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হ'ল। রজনী খুড়ো, জটুদা এবং তপাইদের আরো দুজন বন্ধু স্পটেই শেষ।

রাত বারোটার সময় এই দুর্ঘটনার খবর যখন পেলাম তখন আর করার কিছুই নেই। প্রায় দিন পনেরো হাসপাতালে থাকার পর ছেলেগুলো বাড়ি ফিরল সব। পরে তপাইয়ের মুখে সেদিনের ঘটনার কথা শুনে খুব বকাবকি করলাম ওকে। থানা পুলিশের ঝামেলা মিটল আরো কিছুদিন পর। দুঃখের বিষয় বুড়োর দেওয়া এক হাজার টাকা তপাইয়ের পকেটেই ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার পর সে টাকা কোথায় উধাও হ'ল তা বলতে পারল না কেউ। তবে ছেলেটা যে আরো দৌরাত্ম করার জন্য প্রাণে বাঁচল আমাদের কাছে এই ঢের।

www.arisumu.com

চতুর্থ অধ্যায়

নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় দীর্ঘদিন তপাইয়ের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। যে ছেলেটা হুট করতেই 'মামা' বলে এসে হাজির হোত, অনেকদিন তার সাড়া শব্দ না পেয়ে খুবই চিন্তিত হলাম।

এক রবিবার বিকেলে ওদের বাড়ির দিকে চললাম তাই।

ওদের বাড়ির কাছাকাছি যখন এসেছি তখন ছোটো খাটো একটি ভীড় আমার নজরে পড়ল। ভীড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি একজন লোকের মাথা ফেটেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে লোকটি। আর তাকে ঘিরে পাড়াশুদ্ধু লোকের হৈ চৈ ও ব্যস্ততা। যে লোকটির মাথা ফেটেছে তাকে আমি ভালভাবেই জানি। তপাইদের পাড়ার লোক। নামের সঙ্গে পরিচয় নেই। কিন্তু মুখচেনা বহুদিনের। বেশ ষণ্ডামার্কা গাঁট্টাগোট্টা ভোম্বল দাসের মতো চেহারা। সবসময় রকটি আলো করে বসে থাকে। এর মাথা ফাটালো কে! এর যা চেহারা তাতে এরই তো লোকের মাথা ফাটিয়ে বেড়াবার কথা।

যাই হোক। আমি আসা মাত্রই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল এখানে। দেখলাম সেই ভীড়-ভাট্টার মধ্যে যত লোক দাঁড়িয়েছিল সবাই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। সকলেরই চোখ আমার দিকে। ভাবটা এই, যেন রক্তারক্তির আমিই নায়ক!

সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যে রীতিমতো অস্বস্তি হতে লাগল আমার। কেউ সরাসরি তাকাল। কেউ আড়চোখে দেখতে লাগল। কেউ বা একে অন্যের কানে ফিসফিস করে কি সব বলতে লাগল।

যে লোকটার মাথা ফেটেছে সেও দেখলাম এক হাতে মাথার

একপাশ চেপে ধরে বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি অবস্থা ভালো নয় বুঝে ঘাড় হেঁট করে ওদের এড়িয়ে চলে এলাম। ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারলাম যে এ আর কিছুই নয়, আমার ভাগনা ঘটিত ব্যাপার। তাই আমার গুণধর ভাগনার মামাকে দেখেই পাড়ার লোকেদের এই ফিসফিসানি।

দিদির বাড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন দেখলাম বাড়ির পরিস্থিতিও থমথম করছে। দিদি জামাইবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। আমার বড় ভাগনি মীনা এসেছিল দাঁইহাট থেকে। তারও ম্লান মুখে কথাটি নেই। কি ব্যাপার। ব্যাপার কি! সবাই দেখলাম ভয়ে ভয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল মারাত্মক কিছু শোনার আশায়! কেননা আমি তো বাইরে থেকে আসছি। যদি কিছু শুনে থাকি। তাই ওদের মুখাবয়ব দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম—কি হ'ল? এইভাবে বসে কেন সব? পাড়াতে খুব গণ্ডগোল দেখছি।

দিদি বললেন—আর বলিস কেন ভাই। বাইরে কিছু শুনিস নি?

—না। শুনিনি তো।

—সেকি! কিছু দেখতে পাসনি?

—একটা লোকের মাথা ফেটেছে দেখলাম। দর দর করে রক্ত ঝরছে। আর সবাই একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছে আমাকে। চারিদিকে লোকের ভীড়। জটলা। অবশ্য সে ভীড়ে তপাইকে দেখতে পেলাম না।

দিদি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

বড় ভাগনি বলল—এইজন্যে আসি না মামা এখানে। যখনি আয়ি তখনই দেখি একটা না একটা ঝামেলা লেগেই রয়েছে এ বাড়িতে।

আমি বললাম সব তো বুঝলাম। কিন্তু হয়েছেটা কি শুনি?

দিদি বললেন—কি হয়েছে জানি না ভাই। বল খেলা নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে ঝগড়া। তারপর চেঁচামেচি, গালাগালি। এখন তো শুনছি কার যেন মাথা ফেটেছে।

—হ্যাঁ। মাথা তো ফেটেছে। বেশ ভালো রকমই ফেটেছে মাথা। তাতে হয়েছেটা কি?

—কি আর হবে? থানা পুলিশ হবে। সবাই তো বলছে আমাদের গুণধর ছেলেরই কাজ!

—ও বুঝেছি। সেইজন্যই সব তাকাচ্ছিল আমার দিকে। তপাই কোথায়?

—কি করে জানব? সত্যি। এই ছেলেকে নিয়ে কি যে করি। যত ঝামেলা ওকে নিয়েই। ওর জন্যে এক এক সময় আমার বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ রীতিমতো ঝামেলার ব্যাপার। এর ওপরে যদি থানা পুলিশ হয় তাহলে তো কথাই নেই! তপাই হচ্ছে ফাঁকা মাঠের বেড়াল। ওকে ধরা অত সহজ নয়। কিন্তু যদি ধরা পড়ে তখন বাড়ির লোকদের ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি জামিন হওয়া অনেকদূর গড়াবে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে এলাম।

আসপাশের বাড়ির ছাদে বারান্দায় লোকজন ভর্তি। রাস্তাতেও লোকজনের ভীড়। আমি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই সবার চোখ পড়ল আমার দিকে। আমি লক্ষ্য করলাম সকলেরই চোখের তারায় যেন নীরব অভিযোগ খেলা করছে।

এমন সময় হঠাৎ চারিদিকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। চোখের পলকে ভীড়ও পাতলা হয়ে গেল খানিকটা। দেখলাম কালো প্যান্টের পায়া মুড়ে জামার আস্তিন গুটিয়ে একটা সাইকেলের চেন হাতে ছুটতে ছুটতে আসছে তপাই। ওর সর্বাঙ্গ সপ সপ করছে ঘামে। রাগে হিংস্র হয়ে উঠেছে মুখ। ঠিক এই রকম মূর্তিতে

এর আগে আর কখনো দেখিনি ওকে। ওর পিছু পিছু জনা দশ বারো ছেলেও রয়েছে দেখলাম। প্রধান সাকরেদ ডিকে আর গৌতম রয়েছে। ছিল না শুধু নসীরামের ছেলেটা।

দিদিও কখন যেন এরই মধ্যে দরজার কাছে আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন—ওকে ডেকে নে ভাই। আজ ও চণ্ডাল হয়েছে। না'হলে এখুনি আবার খুনোখুনি করে মরবে।

আমি দরজার কাছ থেকেই হাঁক দিলাম—এই তপাই।

কিন্তু কে দেবে উত্তর?

তপাই একবার শুধু তাকিয়ে দেখল আমাকে।

তারপর গৌতমকে বলল—তুই একটু নজর রাখ ওদিকে। যদি দেখিস থানা পুলিশ হচ্ছে তাহলে খবর দিবি। আমি এদিক সামলাচ্ছি।

ডিকে বলল—আব্বে ফোট। পুলিশে কে খবর দেবেরে বে।

—যদি ওরা সত্যিই থানায় যায়?

গৌতম বলল—থাম দেখি। পুলিশে অমনি খবর দিলেই হ'ল? তুই ঘরে যা তপাই। তোর মামু এসে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক আমরা সামলাচ্ছি। আর পুলিশে যদি খবরই দেয় তো হবেটা কি? পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। মারবে, এই তো?

তপাই হাতের আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে হন হন করে বাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। তারপর বাড়িতে এসে কয়লা রাখার জায়গায় হাতের চেনটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল কুয়োতলায়। দড়ি বাঁধা বালতিটা ডুবিয়ে কুয়োর জল তুলে মুখ হাত পা বেশ করে ধুয়ে উঠোনের তারে ঝোলানো গামছায় জল মুছে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ভাবটা এমন যেন কিছুই হয়নি। হেসে বলল—তারপর মামু! কতক্ষণ?

আর মামু। বললাম—এই কিছুক্ষণ হ'ল এসেছি তা কি ব্যাপার তোমার?

তপাই একবার ওর বাবার দিকে তাকিয়েই আমার দিকে চেয়ে

চোখ টিপল—পরে বলব সব। আপনি যখন বাড়ি যাবেন আমিও যাবো। সাইকেলে করে পেঁছে দিয়ে আসব।

দিদি অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তপাইয়ের দিকে।

তপাই হেসে বলল—আর তাকিয়ে কি করবে? এবার একটু চা করে দাও খাই। মামা চা খেয়েছেন?

—কখন খাবো। যা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছো বাবা।

জামাইবাবু দালানে একটা মোড়ায় বসে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এতক্ষণ তপাইয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। এবার গম্ভীর গলায় ডাকলেন—তপাই শোন।

তপাই এগিয়ে গেল—কি!

—তুই চেন নিয়ে ঘুরছিলি কেন রাস্তায়?

—কি হয়েছে কি তাতে?

—কি হয়েছে তাতে? চেন নিয়ে কারা ঘোরে জানিস?

তপাই একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল—কি করব। যেমন জায়গা সেরকম করতে হয়।

—বুঝলুম। কিন্তু আজ যা করলি তুই এর পরে আর মুখ দেখাতে পারবি পাড়ায়? সব লোক চেয়ে চেয়েদেখছে আর হাসছে।

—যারা হাসছে তাদের হাসতে দিন।

—কি বললি?

—কেন বলব না! কে কি করবে না করবে দোষ চাপিয়ে দেবে আমাদের ঘাড়ে। আমি অমনি সেটা মুখ বুজে মেনে নেবো! বাঃ।

জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ব্রজর মাথা কে ফাটাল? তুই না।

এতক্ষণে জানলাম লোকটির নাম ব্রজ।

তপাই অমনি চেঁচিয়ে উঠল—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তো। শুধু শুধু লোকের মাথা ফাটিয়ে বেড়াব।

—তাহলে ফাটালোটা কে?

—আমি কি করে জানব?

জামাইবাবু বললেন—কিন্তু সব্বাই তো বলছে এই বাড়ির ছেলে ফাটিয়েছে।

তপাই রেগে লাল হয়ে বলল—সেই জন্যেই তো এতক্ষণ চেন নিয়ে ঘুরছিলুম। ভীড়ের ভেতর কে কি করল না করল দোষ পড়ল আমাদের ঘাড়ে। শুধু তাই নয়, ঝগড়া হচ্ছে ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে ইট পড়বে কেন? একটুর জন্য বাচ্চা মেয়েটা রক্ষে পেয়ে গেল সেটা জানেন না বোধ হয়?

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ইট ফেলেছে। কোথায়!

তপাইয়ের হয়ে আমার ভাগনিই উত্তর দিল—আর বোলো না মামা। তোমার নাতনিকে উঠোনে কাঁথা পেতে শুইয়ে আমরা কথা বলছি এমন সময় এই এত্তো বড় একটা ইট এসে পড়ল মেয়েটার মাথার পাশে।

আমি চমকে উঠলাম—সেকি!

—দেখবে ইটটা! বলেই অদূরে পড়ে থাকা ইটটাকে কুড়িয়ে এনে আমাকে দেখাল।

ইটটা হাতে নিয়েই শিড়রে উঠলাম আমি। এই ইট সত্যিই যদি এসে পড়ত মেয়েটার গায়ে তাহলে কি অবস্থা হোত!

তপাই বলল—এর পর আর মাথার ঠিক থাকে?

বললাম—না। এই জন্যেই কি ওর মাথা ফাটিয়েছিস?

তপাই বলল—মামা, অমন কাঁচা কাজ আমি করি না। আছি ভালো। কিন্তু রাগলে আমি বিষখোবড়া ছেলে। আমি তখন এখানে থাকলে ওর মাথা ফাটাতাম না। হাত দুটোকেই ছিঁড়ে আনতাম। আমার নাম তপাই।

—তাহলে ফাটালো কে!

—কে জানে। ওরা স্বপনের নাম বলছে বলে অত রেগে গিয়েছিলুম।

—স্বপন!

—হ্যাঁ। ওরা বলছে স্বপন ওর মাথা ফাটিয়েছে। স্বপন

আমার ছোট ভাগনা। বারো তেরো বছরের ছেলে। সে কি করে মাথা ফাটাবে ঐ ষণ্ডা গুণ্ডাটার? এও কি সম্ভব? তাছাড়া স্বপন অতি শান্ত ও মেধাবী ছেলে।

দিদি বললেন—স্বপন কোথায়?

—জানি না। বোধ হয় ক্লাবে গিয়ে জটলা করছে।

জামাইবাবু বললেন—কিন্তু এত লোক থাকতে স্বপনের নামই বা করছে কেন ওরা?

তাহলেই বুঝে দেখুন। ভীড়ের ভেতর কে গিয়ে মাথা ফাটাল আর দোষ চাপল একটা বাচ্চা ছেলের ঘাড়ে। এর পরেও মাথা গরম না হয়ে যায়?

দিদি নিজের মনেই বলতে লাগলেন—জানি না বাবা, কি যে আছে কপালে। কপালগুণে জুটেওছে সব এসে আমার কাছে।

আমার ভাগনি কথাবার্তার ফাঁকেই চায়ের জল বসিয়েছিল। এবার তৈরী চা নিয়ে এসে কাপে কাপে ঢেলে দিল সবার হাতে।

সবে এক চুমুক দিয়েছি চায়ে এমন সময় এক মধ্য বয়সী মহিলা এসে হাজির হলেন সেখানে। কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন—তপাই কোথায় গো, তপাই?

জামাইবাবু মোড়ায় বসেছিলেন। উঠে এসে বললেন—আসুন কাকিমা। তপাই এই তো ঘরে।

মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তোমরা কেন মিছি মিছি মাথা গরম করছ বাবা? আমরা তো কিছু বলিনি তোমাদের। শুধু শুধু লাশ ফিলে দেবো, বিলা করে দেবো, এসব কি কথা? তা থাকগে। আমার ছেলের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। আর কিছু কোর না তোমরা। আমার ছেলের দোষ আছে জানি। তোমরাও তো মাথা ফাটিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছ। ব্যাপারটার এখানেই শেষ হোক। না কি গো মামা?

আমি আর কি করি। বললাম—সে তো বটেই। রাগারাগির মাথায় যা হবার তা হয়ে গেছে। আর একে বাড়তে দেওয়া উচিৎ

নয়।

তপাই রেগে বলল—আবার আপনি ঐ একই কথা বলছেন, আমরা মাথা ফাটিয়েছি?

www.arisumu.com

তারপর একহাতে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—

মহিলা বললেন—আমি তো চোখে দেখিনি বাবা। আমার ছেলে বলল, তোমার ছোট ভাই মাথা ফাটিয়েছে। তাই বলছি।

তপাই বলল—আপনি আর একবার ভালো করে জিজ্ঞেস করে আসুন, আমার ছোট ভাই ফাটিয়েছে না আমার মামা ফাটিয়েছে।

মহিলা গালে হাত দিয়ে বললেন—ওমা সেকি কথা। তোমার মামা এই তো এলো। সে ভদ্রলোকের ছেলের নামে দোষ দেবো কেন? এভাবে গায়ে পড়ে দোষ নিও না। যা সত্যি তাই বললুম!

—ঐ জন্যেই তো চেন নিয়ে ছুটেছিলুম। আমার ভাই একটা বাচ্চা ছেলে, সে গিয়ে তোমার ঐ চল্লিশ বছরের ধেড়ে ইঁদুরের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে এলো এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা?

দেখলাম কথা কাটাকাটি উত্তরোত্তর চরমে গিয়ে পেঁছিচ্ছে। তাই মধ্যস্থ হয়ে বললাম—আচ্ছা ঠিক আছে। যা হবার তা হয়ে গেছে।

এখন ব্যাপারটা কি হয়েছে দেখছি। বলে তপাইকে জিজ্ঞেস করলাম—স্বপন কোথায়?

জামাইবাবু বললেন—যেখানেই থাকুক। ওর কানটাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসো দেখি?

এমন সময় দেখা গেল আমার বড় ভাগনা শঙ্করই ওকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

জামাইবাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওর কাছে গিয়ে ঠাস করে মারলেন এক চড়। তারপর এক হাতে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—বল কেন এই সব গুণ্ডামি করেছিস? বল শিগ্‌গির। খুনে হবি? ডাকাত হবি? বল কেন মাথা ফাটিয়েছিস ব্রজর?

স্বপন রেগে ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়িয়ে বলল—আমি ফাটিয়েছি। আপনি দেখেছেন?

—আমি দেখব কেন? সবাই তো বলছে।

স্বপন বলল—এ পাড়ায় মানুষ আছে নাকি? যত সব মিথ্যেবাদীর দল। যে বাপের ব্যাটা হবে সে আমার সামনে এসে বলবে।

এর ওপর দিদি এসে এক ঘা বসিয়ে দিলেন—এ পাড়ায় সব মিথ্যেবাদীর দল। আর একা তুমি যুধিষ্ঠির না? পাড়াশুদ্ধু লোক সবাই মিথ্যে বলছে?

স্বপন রেগেমেগে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গর গর করতে করতে কুয়োতলায় গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে কোচিং-এ পড়তে চলে গেল।

স্বপন চলে যাবার পর মহিলাও চলে গেলেন।

জামাইবাবু—বললেন—আপনি যান কাকিমা। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। বলে জামা-কাপড় পাল্টে জামাইবাবুও চলে গেলেন।

জামাইবাবু চলে যাবার পর দিদি বললেন—সত্যি করে বল তো তপাই, ব্রজর মাথা কে ফাটিয়েছে?

তপাই ফিক করে একটু হাসল। সে হাসির অর্থ সবাই বোঝে।

আমার তো চোখ কপালে উঠে গেল।

তপাই বলল—স্বপনই ফাটিয়েছে।

—বলিস কিরে!

তপাই বলল—মামা, আমি একটা দাগী ছেলে। আমার কথা ছেড়ে দিন। তবে আপনার ঐ ছোট ভাগ্নাটিকেও কিছু কম বলে মনে করবেন না।

—কিন্তু স্বপন ঐটুকু ছেলে···।

—ও একটা মিচকে শয়তান। থাকে নিরীহ প্রাণীটির মতো। কিন্তু রাগলে কারো নয়। তবে আজকে ও যা করেছে তা ঠিক করেছে। আপনি একবার ভেবে দেখুন তো, ঐ অতবড় ইটটা যে বাড়ির ভেতর পড়ল যদি কারো মাথায় লাগত?

—সে তো বটেই। তবে ব্যাপার কি জানিস, হুট করে রাগের মাথায় সহসা কোন কাজ করতে নেই। ধর স্বপনের ইটের ঘায়ে লোকটা যদি মরে যেত? যদি ওরা এই ব্যাপার নিয়ে থানা পুলিশ করত?

তপাই বলল—হিম্মৎ থাকে তো এখনো করুক না। ইট তো তোলাই আছে। পুলিশ এলে দেখাব।

—কিন্তু স্বপন ওর মাথাটা ফাটাল কি করে ?

তপাই বলল—তাহলে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই শুনুন। এই মাঠে আমাদের দুটো গ্রুপ আছে। একটা ছোটদের একটা বড়দের। ছোটরা যখনই মাঠে খেলে বড়দের তখনই চোখ টাটায়। আজ বিকেলে ছোটরা যখন খেলছিল, বড়রা তখন মাঝে মাঝে এসে নানারকম মন্তব্য করছিল। তবে খারাপ কেউ কিছু বলেনি। এমন সময় ব্রজদা হঠাৎ কোথা থেকে এসে গালাগালি শুরু করে দিল। তারপর কোথাও কিছু নেই গা-জোয়ারি করে গোল-পোস্টটাকেই উবড়ে ফেলে দিল। তাইতেই কে যেন একজন মুখ খারাপ করে কি বলেছে। সেই রাগে কোথাও কিছু নেই দুম-দাম ইট ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিল ব্রজদা। স্বপন তখনও কিছু বলেনি। কিন্তু যেই একটা ইট এসে আমাদের বাড়িতে পড়েছে অমনি ওর মাথা গেছে গরম হয়ে। তার ওপর বাড়ি এসে যখন দেখল আর একটু হলেই দিদির মেয়েটা শেষ হয়ে যেত তখন আর থাকতে পারল না। ঐ ইটটা ও নিয়ে গিয়ে ওরই মাথার ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। একেবারে মোক্ষম ঘা যাকে বলে।

দিদি বললেন—অথচ স্বপন আমাকে বলল ইটটা আমি পাড়ায় দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। কি শয়তান ছেলে বল দেখি ?

আমি বললাম—ও কিছু না। ছোটবেলায় একটু আধটু ডানপিটে অনেকেই থাকে। বড় হলে বুঝতে শিখলে ঠিক হয়ে যাবে। ওর জন্যে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।

আলোচনা শেষে চুপ-চাপ বসে রইলাম আমরা। মুখের কথা আর হাতের ঢিল একবার বেরিয়ে গেলে আর তো তাকে ফেরানো যাবে না। অগত্যা চুপ-চাপ বসে থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি ?

তপাই এবার ঘরে ঢুকে জামা প্যাণ্ট ছেড়ে আমাকে ইসারা করল। অর্থাৎ কিনা চলুন এবার।

আমিও আসি বলে উঠে দাঁড়ালাম।

ছোট ঘর থেকে সাইকেলটা বার করল তপাই।

আমি ওকে চুপি চুপি বললাম—চল। তবে সামনে দিয়ে নয়। নতুন রাস্তা দিয়ে ঘুরে। নাহলে আবার যদি সবাই দেখতে আরম্ভ করে তো ভারি বিশ্রী ব্যাপার হবে।

তপাই বলল—সে কথা আবার বলতে ? এই আমিও যে যাচ্ছি রাত এগারোটার আগে কি আমি ঘরে ঢুকব ?

আমি তপাইয়ের সাইকেলে সামনের দিকে বসলাম। ও ডবলক্যারি করে আমাকে মধ্য হাওড়ায় আমাদের বাসস্থানের দিকে নিয়ে চলল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে এসেই দেখি শঙ্কর এসে বসে আছে। শঙ্কর আমার বড় ভাগনা। এদের দু'ভাইয়ের থেকে একেবারেই অন্যরকম। লেখাপড়া মন দিয়ে করে না। তবে কোন ঝামেলাতেও বড় একটা থাকে না।

শঙ্করকে দেখে বললাম—কি ব্যাপার রে ?

—মা একবার দেখা করতে বলেছে আপনাকে। খুব দরকার। সাইকেল এনেছি। রাত্রিবেলা পৌঁছে দিয়ে যাব।

—বেশ যাবো। এই তো এলাম। আগে একটু চা টা খাই।

—সে খান না। আমিও তো খাবো।

আমি অফিসের পোশাক ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে এলে মামা ভাগনা দুজনেই এক সঙ্গে চা-রুটি খেলাম। তারপর ওর সাইকেলে চেপেই চললাম—ওদের বাড়ি।

দিদি জামাইবাবু আমার বড় ভাগনি সবাই ছিল।

আমি ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম—হঠাৎ এমন জরুরি তলব কেন দিদি ?

দিদি বললেন—তোর কাছ থেকে একটা পরামর্শ নেবো বলে ডেকেছি তোকে।

—কি রকম।

—ভাবছি তপাইটাকে এখান থেকে কোথাও সরানোর ব্যবস্থা করি। নাহলে ঐ বিষবৃক্ষ আমার সব ছেলেদেরকে নষ্ট করে দেবে।

আমার দিদির ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে মেয়ে। তারপর ছেলে অর্থাৎ শঙ্কর। শঙ্করের পর তপাই। তারপর স্বপন। দিদির কথা শুনে হেসে বললাম—হঠাৎ আবার কি ভূত মাথায় চাপল তোমাদের? কালকের ঐ ব্যাপারটা নিয়ে? তাই যদি হয় তাহলে তপাইয়ের এখানে দোষ কোথায়?

জামাইবাবু বললেন—আছে দোষ আছে। কাল কি ভাবে লোকটার মাথা ফাটিয়েছে তা তুমি ভাবতেও পারবে না। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে লোকটাকে।

—কিন্তু ওর মাথা তো আপনার ছোটছেলে ফাটিয়েছে।

—মূলে তো তপাই। নাহলে এত সাহস পায় কোত্থেকে? তপাইয়ের মূর্তি দেখলে না কাল?

—দেখলাম তো।

—তবে!

—ওর পাল্লায় পড়েই স্বপনটা ঐরকম হয়েছে। নাহলে ঐটুকু ছেলের কি দুঃসাহস। এখনই যদি এই রকম নিষ্ঠুর হয় তো পরে কি হবে?

আমি হেসে বললাম—দেখুন, ছেলে আপনাদের। তাকে ভালো করবার জন্য যত রকম চেষ্টা করা যায় করুন আপনারা। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা যে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে, দুদিন বাদে আপনাকেও হয়তো···?

জামাইবাবু রেগে বললেন—এই জন্যেই আমি ডাকতে চাই না তোমাকে। তুমি সবসময় হেঁয়ালি করে কথা বলো। আমার ছেলেদের তুমিও যথেষ্ট আস্কারা দাও।

দিদি বললেন—তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না। স্বপনের এখন ধারণা হয়েছে কি জানিস, যা কিছুই করুক না কেন সে, তার

www.arisumu.com

মস্তান দাদা তপাই তো আছে। তপাইয়ের ভয়ে কেউ কিছুই বলবে না। সেইজন্যই অত সাহস। তার চেয়ে ওকে যদি এখান থেকে বিদেয় করতে পারি তো সবকিছুর শান্তি।

আমি কি উত্তর দেবো ভেবে পেলাম না। বাবা মা কতখানি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলে তবে ছেলেদের ওপর এতখানি রেগে যান তা বুঝলাম।

দিদি আবার বললেন—ও ছেলে ঘরে থাকলে আমার আর দুটো ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে। দিন রাত শুধু মড়া পোড়ানো আর ঝুটঝামেলা করা। ওর জন্যে পাড়ায় আমরা মান-ইজ্জত সব খুইয়েছি। তাই ভাবছি আমাদের আর দুটো ছেলের মুখ চেয়ে ওকেই সরাই।

কথাটা বড়ই মর্মান্তিক। শুনে বুকের ভেতরটা টন টন করে উঠল। অথচ ছেলেটাকে শোধরাবার জন্য কিছু একটা করতে তো হবে।

ভাগনি বলল—আমি বলছিলুম কি মামা ও আমার সঙ্গে বরং দাঁইহাটেই চলে যাক।

—বেশ তো। এ তো খুবই ভালো কথা। সঙ্গগুলো একটু ত্যাগ করিয়েই দেখ না যদি কিছু হয়।

দিদি বললেন—কিন্তু ও তো যেতে চাইছে না।

—কেন কি বলছে ও?

—ও বলছে কুটুমবাড়িতে ও থাকবে না।

—তাহলে তোমাদের দেশে পাঠাও।

—সে তো আর এক জায়গা। সেখানেও যা সব আছে গোটাকতক তার ওপর উনি ভিড়লে তো একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ হয়ে যাবে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম—ওর ছোট পিসিতো তারকেশ্বরে থাকে। সেখানে রেখে এলে হয় না?

—হয়। তবে ওদেরও অভাবের সংসার। তপাই কিন্তু ওখানেই

যেতে চাইছে। তোর জামাইবাবু রাজি হচ্ছে না।

—ওরা কিন্তু খুব ভালো লোক। আমার কথা যদি শোনো তো ওকে ওখানেই পাঠাও। মাঝে মধ্যে কিছু খরচা নাহয় পাঠিয়ে দিও।

জামাইবাবু বললেন—অসুবিধেটাতো সেইখানেই। ওরা কি খরচ খরচা নেবে ?

এমন সময় তপাই এলো। কোথায় আড্ডা মারছিল কে জানে। উঠোনের জবা গাছের কাছে সইকেলটা রেখে দালানের সিঁড়িতে হাত পা ছড়িয়ে বসে বলল—আমার বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠেছে। শুনেছেন তো মামা। আমি এখন এ বাড়ির আপদ বালাই। মাছের কাঁটার মতো আমি আটকে আছি প্রত্যেকের গলায়। তবে মামা আমিও বলে রাখছি, এই পাড়া থেকে আমি চলে গেলে এদের অবস্থাটা একবার কি হয় দেখে রাখবেন। এদের যদি ছাগলে মুড়িয়ে না খায় তো আমার নাম তপাই নয়। আমার ভয়ে এখানে কেউ ট্যাঁ ফোঁ করে না। এইবার দেখবেন কথায় কথায় ঝাড় খাবে কিরকম! যাক। ভালোই হ'ল। এদের উঁচু মাথা আরো উঁচু হোক। এ সব পাড়াকে তো এরা চেনে না। পায়ে পা তুলে যখন উল্‌খাট ঝামেলা লাগাবে তখন বুঝবে। আমি তখন 'ভোলে বাবার' ডেরায় বসে মজা দেখব। তাছাড়া সত্যি বলতে কি আমারও খুব একঘেয়ে লাগছিল এখানে। এবার আমিও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। তবে এই যে আমি বাড়ি ছাড়ছি, আর আমি এ মুখো হবো না কোনদিন।

দিদি রেগে বললেন—দরকার নেই তোর এ মুখো হবার। তোর মুখ দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন করে।

তপাই হেসে বলল—বেশ তো। আমি বিদেয় হই, তারপর রোজ দুবেলা তোমার অন্য ছেলেদের মুখ ধুয়ে তুমি জল খেয়ো। কেমন ?

আমি দুপক্ষকেই সামলালাম। দিদিকে বললাম—দেখ, যতই

দুরন্ত হোক, তবু তোমার ছেলে। ও কথা বলতে নেই।

দিদি মুখের ওপরই বললেন—তুই বিশ্বাস কর, ও মরে গেলেও আমার চোখ দিয়ে এতটুকু জল পড়বে না।

এর ওপরে আর কথা নেই। তপাইকে বললাম—অভিমান করিস না তপাই। তোর ভালোর জন্যেই তোকে এখান থেকে সরানো হচ্ছে।

তপাই হোঃ হোঃ করে হেসে বলল—অভিমান! কার ওপর ? মা বাবার ওপর ? মামা, মড়া মানুষকে চিতায় তোলা আমার নেশা। মানুষগুলো যখন আগুনের আঁচে ফুট ফাট করে পোড়ে আমি ভখন হাসি। মনে মনে বলি, এই তো তোমাদের অন্তিম পরিণতি। এর জন্যে এত কিছু ?

আমি বললাম—ও সব কথা রাখ। জীবন সম্বন্ধে নির্বিকার হওয়া ভালো। তবে এখনো বলছি তোর পরিবেশ পরিবর্তন করা একান্ত দরকার। তাছাড়া দিনকাল একে খারাপ। এর ওপর দুদিন ছাড়াই এই সব ঝামেলা হতে থাকলে মানসিক অবস্থারও অবনতি হবে। আসলে তুইও ভালো ছেলে। কিন্তু এই নোংরা পরিবেশের জন্যে আজ তুই এইরকম হয়ে গেছিস। ভালো জায়গায় যা, ভালো পরিবেশে থাক, দেখবি কত পরিবর্তন হয়েছে তোর। তাছাড়া অন্য পরিবেশে গেলে নিজেও একটু শান্তি পাবি। ভালো না লাগে ফিরে আসতে কতক্ষণ ? এই বলে আমি চলে এলাম।

তপাই গুম হয়ে বসে রইল।

পরদিন সকালে দিদি নিজে গিয়ে তপাইকে তারকেশ্বরের কাছে একটি গ্রামে ওর পিসির বাড়িতে রেখে এলেন।

হাওড়ার এই ঘিঞ্চি সহরের বাইরে হুগলি জেলার ছাড়া সুনীবিড় ঐ গ্রামখানি তপাইয়ের মন্দ লাগল না। পুকুর বাগান ধানক্ষেত ফাঁকা মাঠ—মাঠের মেঠো গন্ধ তপাইয়ের মন প্রাণ ভরিয়ে দিল।

আমরা ভেবেছিলাম সহরের এই পরিবেশ ছেড়ে তপাই

কিছুতেই গ্রামে থাকতে পারবে না। দুদিন কি চারদিন থাকার পর একদিন হয়তো ঠিকই পালিয়ে আসবে। কিন্তু না। তপাই আমাদের সকলের ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিল।

মা বাবা যতই বকা ঝকা করুন না কেন, হাজার হলেও ছেলে তো। প্রতিদিন খাওয়া দাওয়ার পর ওর জন্য দুটো ভাত তরকারি আলাদা রাখা থাকত। কি জানি কোনদিন হঠাৎ যদি দিন দুপুরে ছেলেটা এসে হাজির হয়।

কিতু না। ওর আশা করাই বৃথা হ'ল সকলের। গ্রামের পরিবেশে গিয়ে তপাই এমন ভাবে গ্রামকে ভালবেসে ফেলল যে সহরকেই ভুলে গেল এক সময়। কোথায় গেল ডিকে, কোথায় গৌতম, কোথায় নসীরামের ছেলে। সেখানে গিয়ে দু'-চারদিন ভিজে বেড়ালের মতো থাকার পর আবার নতুন সঙ্গী পেয়ে মেতে গেল।

এখনকার গ্রামও তো আর আগেকার সেই গ্রাম নেই। প্রতিটি গ্রামেই এখন ডজন ডজন তপাই জন্মায়। কাজেই লাইনের ছেলে বেশ কয়েকটা জুটে যেতে খুব একটা দেরি হ'ল না তপাইয়ের।

দু'চারদিন মাঠে ঘাটে একা একা ঘোরা ফেরা করতেই নজরে পড়ে গেল সকলের।

একদিন কয়েকজন ছেলে এসে ধরল ওকে—কি ভায়া! কোত্থেকে আমদানি হ'লে?

তপাইয়েরও নিজস্ব কিছু ভাষা আছে। সেই ভাষাতেই সেও জবাব দিল—আমি হাওড়ার মালরে বে। দেখে বুঝতে পারছিস না?

ওরা বলল—গুরু গুরু। তা এখানে কি ব্যাপারে?

—নির্বাসন।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। যেখানে থাকতুম সেখানে, মানে আমার বাড়িতে পাড়ায়, নিজের গুণের জন্যে সকলের কাছে একটু অসহ্য হয়ে উঠেছিলুম। তাই আমার বাড়ির লোকেরা এখানে আমাকে আমার

পিসির বাড়িতে নির্বাসন দিয়ে গেছে!

—বলো কি। তবে তো তোমার সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে হচ্ছে ভাই।

তপাই হাত মেলাবার জন্য হাত এগিয়ে দিল।

ওর হাতে হাত মিলিয়ে বলল—তোমার নামটি কি ভাই?

তপাই বলল—আমার ভালো নাম তপন। তোমরা আমাকে তপাই বলেই ডেকো। কেননা ঘরে বাইরে পুলিশের খাতায় ঐ নামেই আমি বিখ্যাত।

—গুরু গুরু। তা গুরু, একটা কথা আগেই বলে রাখি। তোমার বাড়ির লোক তোমাকে তাড়াতে পারে, পাড়ার লোক দূর দূর করতে পারে, বন্ধুরা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, আমরা কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না। এই যে আমাদের কটি মাল দেখছ, সবাই আমরা একই সুতোয় গাঁথা মালা।

—বাঃ শুনে খুশি হলাম।

—খুসির এখন হয়েছে কি। আরো খুসি হবে শুনে, আমরাও তোমারই মতন বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে। আমরা তোমাকে বুকে করে রাখব। আমরা শুধু খাবার সময় ঘরে যাই আর বাকি সময় হৈ হৈ করে বেড়াই।

তপাই খুসি হয়ে বলল—বেড়ে মজা তো।

—মজা হবে না কেন? আমাদের তো তোমাদের মতন রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে চাল কিনে খেতে হয় না। জমি জমা যা আছে তাতে সকলের দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে হয়ে যায়। আর তুমি যদি বরাবরের জন্যে থেকে যাও গুরু, তাহলে আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ি করে পেটটা ঠিক চলে যাবে তোমার।

—ঠিক বলছ?

—বাবা তারকনাথের দিব্যি।

তপাই বলল—তবে ভাই একটা কথা। এই হৈ হল্লার ফাঁকে ফাঁকে আমি আরো একটা কাজ ওখানে করতাম। তোমাদেরও কিন্তু

আমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সেই কাজটা এখানেও করতে হবে।

—কি রকম !

—এই ধরো চাঁদা তুলে কোন গরীবের মেয়ের বিয়ে দেওয়া। কোন দুঃস্থ মানুষের মৃতদেহ দাহ করা। এইসব কাজ আর কি !

—আরে ব্বাস ! তুমি যে দেখছি হিন্দী ফিল্মের হিরো। ঠিক আছে। রাজি আছি।

—সেইসঙ্গে আরো একটা কাজ করতে হবে।

—কি কাজ বলো ?

—এই গ্রামে আমরা কজন এমন একটা দল গড়ে তুলব যে আশপাশের লোকেরা যেন আমাদের রীতিমতো ভয় করে। আমাদের ভয়ে রাত ভিতে এই গ্রামে চোর-ডাকাত ঢুকতেও ভয় পায় যেন।

—গুরু গুরু। আবার হাতে হাত মেলাও। সবাই রাজি আমরা। তুমি গুরু একেবারে হিরোর মতো এসে হাজির হয়েছ। জয় বাবা তারকনাথ।

সবাই তখন তপাইকে পেয়ে এমনভাবে মেতে উঠল যে ওকেই ওদের লিডার করে ফেলল। আসলে তপাইয়ের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে খুব সহজেই ও অন্যকে বশ করে ফেলতে পারে।

আলাপের প্রথম দিনই তারকেশ্বরে গিয়ে একটা হিন্দী ছবি দেখে এলো ওরা।

তারপর একদিন গেল চাঁপাডাঙায় দামোদর বাঁধ দেখতে। দামোদরের বাঁধ কি চমৎকার।

সবচেয়ে চমৎকার এখানকার পরিবেশ। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মাঠে ঘোরা আর পাখির ডাক শোনা। তারপর চা-মুড়ি খেয়ে বন্ধুদের আড্ডায়। বেলা বারোটা পর্যন্ত আড্ডা মেরে বাড়ি ফেরা। এরপর পুকুরে টুপ টুপ করে ডুব দিয়ে মাটির দাওয়ায় বসে পেট পুরে খাওয়া। ডাল-ভাত তরকারি। বরাৎ যেদিন ভালো থাকে সেদিন চুনোপুঁটি ল্যাটা পোনাও জোটে। খাওয়া শেষে পান মুখে আবার বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হওয়া। তারপর কখনো

খড়ের গাদায় কখনো গাছতলায় কখনো বা ক্লাবঘরে শুয়ে তেড়ে ঘুম। বিকেলবেলা ইউরিনের মতো এক কাপ চা। তারপর আবার সেই বিশ্ববখাটেদের দলে ভেড়া। মাঠে মাঠে ঘুরে, আশপাশের গ্রামগুলোকে চষে, কখনো বা নাইট শো'তে তারকেশ্বর অথবা চাঁপাডাঙায় সিনেমা দেখে, কোন পুকুরপাড়ে অথবা বাঁধের ধারে নেশা করে পড়ে থাকা। যেদিন ঐসব করা সেদিন আর ঘরে ফেরা নয়। কি চমৎকার জীবন। কাজ করতে হয়না। কিছু করতে হয় না। শুধু খাও-দাও আড্ডা দাও টোটো করে ঘোরো আর স্ফূর্তি করো। কি মজা। এমন জীবন কে না চায় ? এত সুখ যে স্বর্গেও নেই।

একদিন ওরা রাত্রিবেলা চাঁপাডাঙা থেকে সিনেমা দেখে ফিরছিল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ উঠল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। ওরা ছুটতে ছুটতে বাঁধ থেকে নেমে কাছেই শ্মশান যাত্রীদের জন্য তৈরী একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

বেশ বড়সড়ো কোঠা ঘর। জানলা দরজা সবই আছে। শুধু আলোর কোন ব্যবস্থা নেই। শ্মশান যাত্রীরাই যে যার লণ্ঠন বাতি সঙ্গে নিয়ে আসে। যাই হোক। ওরা ঝড় জলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেই শ্মশান ঘরেই গিয়ে ঢুকল। একটু পরেই নামল বৃষ্টি। বৃষ্টি তো নয়। প্রবল বর্ষণ। যেমনি ঝড় তেমনি জল। সে কি প্রচণ্ড বেগ। ওরা ঝড় জলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমস্ত জানলা বন্ধ করে দিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হুট হাট করে খুলে গেল জানলা দরজাটা।

ভারি মজার ব্যাপার তো।

দরজায় খিল আছে। জানলায় ছিটকিনি আছে। তবু খোলে কি করে ?

তপাই বলল—নিশ্চয়ই আমাদের ভেতর থেকে কেউ গিয়ে

বদমায়েসী করে খুলে দিয়েছিস ?

বন্ধুরা বলল—না। কে খুলবে আমাদের ভেতর থেকে ? আমরা তো সবাই পাশাপাশি বসে আছি। ঝড়ের দাপটেই খুলে গেছে নিশ্চয়ই।

একজন বলল—ঝড়ের দাপটে জানালা খুলে গেলেও দরজা খোলে কি করে, দরজায় তো খিল দেওয়া ছিল।

আর একজন বলল—আমি কিন্তু ভালো বুঝছি না। এই জায়গাটার খুব বদনাম আছে। অনেকদিন আগে একটা লোক এই ঘরে গলায় দড়ি দিয়েছিল। তারপর থেকে এই জায়গা সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক কথাই শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে ঐ রকমই কিছু।

বন্ধুরা বলল—তা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মুসকিল হ'ল এই ঝড় জলে এখানকার এই আশ্রয় ছেড়ে যাই ই বা কি করে ?

তপাই বলল—দেখ ভাই, পোড়া বাড়িতে রাত কাটানো বা শ্মশানের বিভীষিকার সঙ্গে পরিচয় আমার নতুন নয়। আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি আমরা দরজায় খিল দিতে বা জানলায় ছিটকিনি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে সশব্দে জানলা দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

তপাই বলল—ভালোই হল। বলে নিজেই উঠে গিয়ে অন্ধকার হাতড়ে দরজায় খিল দিল, জানলায় ছিটকিনি আঁটল। তারপর নিশ্চিন্ত মনে এসে বসল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। বলল-আজ যা অবস্থা দেখছি তাতে আর বাড়ি ফিরতে হচ্ছে না। আজ সারারাত এখানেই পেট কোলে করে বসে থেকে কাল সকালে ঘর মুখো হওয়া যাবে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে ঝড়ের দাপট। থেকে থেকে গোঁ গোঁ করে শব্দ হচ্ছে। এই রকম হতে হতে হঠাৎ এক সময় ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁচ। আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই খিলটা

আপনা থেকে খুলে গিয়ে সশব্দে দুহাট হয়ে গেল দরজাটা।

যেই না যাওয়া সকলেরই তখন চক্ষুস্থির। বসেছিল সবাই। মারল টেনে এক লাফ। তারপর কেউ আর কোনদিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েই দৌড়—দৌড়—দৌড়।

বড় বড় গাছপালার ফাঁক দিয়ে কর্দমাক্ত পথ ধরে ছুটে গিয়ে বাঁধে উঠল সবাই। ভিজে সপ সপ করছে সর্বাঙ্গ। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল সব। সবাই সবাইয়ের মুখের দিকে তাকায় আর ঠক ঠক করে কাঁপে। না কাঁপবেই বা কেন ? যা দেখল তার পরে ভয় না পাওয়াটা কি অস্বাভাবিক ?

তপাই বলল—দেখ ভাই, আমি এখনো বলছি ঐসব আমি বিশ্বাস করি না। তবুও যা দেখলাম তাকেও অবিশ্বাস করতে পারি না। আমি নিজে হাতে যে খিল লাগিয়ে দিয়ে এলাম সে খিল খুলল কি করে ? ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।

বন্ধুরা বলল—ওকেই আমরা ভুতুড়ে ব্যাপার বলি। তোরা সহরের ছেলেরা তো বিশ্বাস করিস না এসব। গ্রামে ঘরে এই রকম কিন্তু প্রায়ই হয়। তপাই বলল—আমার জীবনে এ রকম ঘটনা এই প্রথম।

বন্ধুরা বলল—আসলে অপদেবতারা যে সব সময় দেখা দেয় তা নয়। এই রকম অদ্ভুত কিছু দেখিয়ে প্রথমেই মানুষকে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। এসব দেখেও যদি কেউ কোন গোঁয়ার্তুমি করবার চেষ্টা করে তখন তারা নানাভাবে ভয় দেখায় বা ক্ষতি করে।

তপাই সব শুনল। কিন্তু কিছু বলল না। কিই বা বলবে ? এরকম অভিজ্ঞতা তো এই প্রথম। যাই হোক। ওরা অনেক রাতে ঝড় জল মাথায় করে ঘরে ফিরল।

পরদিন সকালে এই নিয়ে তপাইরা একটা জোর আলোচনায় বসল। শ্মশানঘরের ঐ ক্ষণিকের বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা সকলেই জেনে গেল প্রায়। সবাই বলল—ঐ ঘরটার এই সব

ব্যাপারে একটু বদনাম আছে। অবশ্য লোকের মুখে শোনা। ঐ জন্যে সচরাচর রাত্রিবেলা দলে ভারি না হয়ে কেউ মড়া পোড়াতে গিয়ে ঐ ঘরে ঢোকে না। তবে যা হয়েছে হয়েছে। আর যেন কেউ ভুলেও ঘরে যেও না। খুব ভাগ্য ভাল যে বেঁচে ফিরে এসেছ সব।

কথাটা তপাইয়ের পিসিমা পিসেমশাইয়ের কানেও উঠল। পিসেমশাই তো খুব বকাবকি করলেন তপাইকে। বললেন—দেখো বাবা, তুমি যাতে ভালো হও, বদ সঙ্গে না মেশো সেইজন্যে তোমার মা বাবা তোমাকে আমার এখানে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখানে এসেও তুমি যা আরম্ভ করেছ তাতে তো আমি রীতি মতো ভয় পাচ্ছি। কাজ কর্ম না করো দুঃখ নেই! খাও দাও টো টো করে ঘোরো। শুধু দয়া করে নেশাটি কোর না। আর ঐ বদ ছেলেগুলোর পাল্লায় পড়ে যেখানে সেখানে যেও না। ধরো দৈবাৎ যদি কোন অঘটন ঘটে যেত কাল তাহলে তোমার মা বাবার কাছে কি কৈফিয়ৎ দিতাম আমি? রাত ভিত যে এইভাবে যেখানে সেখানে ঘোরো যদি সাপেই কামড়ায়!

পিসিমা বললেন—সত্যি বলছি, তুই যদি ভালোভাবে না থাকিস তাহলে কালই আমি চিঠি লিখব তোর বাবাকে।

তপাই বলল—রাগ করছ কেন পিসি? কি থেকে কি হয়ে গেল কাল। ভূত প্রেত ওসব কিছুই নয়। আসলে দমকা হওয়ার ধাক্কাতেই খিলটা খুলে যাচ্ছিল।

—তা সে যাই হোক বাবা। আর কখনো যাস না সেখানে! আর একটা কথা, আজ থেকে সন্ধ্যে হলেই ঘরে ঢুকবি। প্রত্যেকে নিন্দে করছে তোর। সবাই বলছে, বামুনের ছেলে, ভদ্দর লোকের ছেলে এই বয়সে নেশা ভাঙ করা কি? ছিঃ। তোর কি লজ্জাও নেই বাবা? কি হয় ঐগুলো সব গিলে?

তপাই বলল—আমি তোমার পা ছুঁয়ে আর বাবা তারকেশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি আজ থেকে ওসব আমি একদম ছোঁব না। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি আমি আজ আছি কাল নেই।

আমিও বুঝি এগুলো খারাপ। শুধু শুধু আমার জন্যে তোমরা কেন বদনামের ভাগি হবে। তার চেয়ে ওসব আর একদমই ছোঁব না আমি।

পিসেমশাই বললেন—আজ আছি কাল নেই মানে? সারাজীবন থাক না তুই এখানে। খা দা' জমি জমা দেখা শোনা কর। তোর বিয়ে থা দিয়ে ঘর সংসার করে দেবো আমরা। অযথা বয়ে যাবি কেন? জীবনটা কি ছেলেখেলার জিনিস? জীবনের দাম নেই?

—তপাই বলল—ঠিক বলেছেন পিসেমশাই। আমি খুব ভুল করেছি এতদিন। এবার থেকে আমি সত্যিই ভালো ছেলে হবো। অনেক বদমায়েসি করেছি। অনেক জ্বালাতন করেছি। আর নয়। বাবা তারকনাথের দিব্যি।

তপাই সকালে আর ঘর থেকেই বেরল না। সারাটা দিন শুধু ঘুমিয়েই কাটাল।

বিকেলবেলা একবার শুধু একা একা দীঘির পাড়ে বেড়াতে গেল।

এমন সময় কেষ্ট মালিকের সঙ্গে দেখা। কেষ্ট মালিকের বয়স হয়েছে। তা ষাট পঁয়ষট্টি তো বটেই। মাথা ভর্তি টাক। রোগা খেঁকুরে চেহারা। ঘরামির কাজ করে। তপাইকে দেখেই ডাকল—তপা, তপারে!

তপাই এগিয়ে বলল—কি ব্যাপার কেষ্টদা, তুমি এখানে?

—এই কাজ থেকে ফিরে চান টান করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। তা তুই এখানে একা একা কি করছিস?

তপাই বলল—সবে ঘুম থেকে উঠলুম। কাল অনেক রাতে শুয়েছি। ভালো ঘুম হয়নি।

কেষ্টদা বলল—তা হ্যাঁরে, কি সব যেন শুনছিলুম, তোরা নাকি বাঁধের ধারে ঐ শ্মশান ঘরে ভূতের পাল্লায় পড়েছিলি?

—ভূত কি তা জানি না কেষ্টদা। তবে এই এই ব্যাপার হয়েছিল। বলে তপাই সব কথা খুলে বলল কেষ্টদাকে।

কেষ্টদা তো হেসেই অস্থির! বলল—ওরে পাগল, ওটা হ'ল জীবদান কাঠ। এক এক রকম গাছের কাঠ থাকে যেগুলো আপনা আপনি নড়াচড়া করে। তাতে ফার্নিচার করে ঘরে বসালেও সেটা ঘটাং ঘটাং করে শব্দ করবে। নয়তো একটু একটু করে স্থানান্তরে সরে যাবে। আমার মনে হয় ঐ ঘরের খিল বা দরজা জানালাগুলো সম্ভবতঃ ঐ কাঠের।

তপাই বলল—যে কাঠেরই হোক। বেশ রহস্যময় ব্যাপার।

—কাঁচকলা।

—না কেষ্টদা, আমি নিজে চোখে দেখেছি।

—গুষ্টির মাথা। কিছু নেশা-টেশা করেছিলি?

—তা একটু করেছিলুম। তবে বেশিরকম কিছু নয়। জ্ঞান ছিল। তাছাড়া বৃষ্টিতেও ভিজেছি খুব। কাজেই নেশার ঘোরে নয়। সত্যিই দেখেছি।

কেষ্টদা একটু গম্ভীর হয়ে বলল—দেখ, তুই আমার ছেলের বয়সি। সহরে থাকিস। আর আমি এই গ্রামে ঘরে মানুষ হয়ে এত বড়টা হলাম। আমার তিনটে মেয়ে সাতটা ছেলে। কিন্তু আমি কখনো ভূত দেখলুম না, আর তোরা সেদিনের ছেলে ছোকরারা এসে যা বলবি তাই বিশ্বাস করে যাব? আমি এখনো বলছি ভূত নেই। ওসব তোদের মনের ভ্রম।

—তুমি যদি বিশ্বাস না করো তো কি বলব কেষ্টদা। ভূত আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু কাল যা দেখলুম তাকে অবিশ্বাস করি কি করে?

কেষ্টদা বলল—যাক। মরুক গে। ভূত থাকুক আর না থাকুক তাতে তোরই বা কি আমারই বা কি? তা তুই যখন আছিস তখন একা একা কেন খাই। বেশ কটকটে করে শোল মাছের ঝাল তৈরী করিয়ে এনেছি। আয়, তাই খেতে খেতে দুজনে একটু গলা ভেজাই।

—না কেষ্টদা। ওসব আমি আর খাবো না। এবার থেকে

আমি ভালো ছেলে হবো। বাবা তারকনাথের দিব্যি দিয়েছি আমি। তার চেয়ে বরং তুমি খাও আমি দেখি।

কেষ্টদা ভুরু কুঁচকে বলল—তার মানে?

—বললুম তো। এবার থেকে আমি ভালো ছেলে হবো।

—ভালো ছেলে হবি? তাই যদি হবি তো খারাপ ছেলে হতে গিয়েছিলি কেন? কপালে 'আগ' মার্কা ছাপ মেরে এখন ভালো হতে চাইছিস? খা বলছি।

—না। ওসব আর খাবো না। পিসিমা খুব বকাবকি করছিল। পিসেমশাইও বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছি আজ।

—সেইজন্যে খাবি না।

—হ্যাঁ। সেইজন্যে আমি বাবার দিব্যি দিয়েছি। আর ছোঁব না ঐসব।

—তাহলে এক কাজ কর। বাবাকে বল, বাবা আজকের দিনটা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আজ খাই। কাল থেকে আর খাবো না।

—খেলেই কিন্তু ওরা জানতে পারবে।

—এখন ঘরকে যাবার দরকারটা কি? ঢ্যাঁটামো করিস না। একটু বোস। সন্ধ্যেটা উত্তীর্ণ হোক। বেশটি করে খেয়েদেয়ে রাত করে যাবি। এখন এইখানে ঘাসের ওপর আরাম করে শো দিকিনি।

আবার মাথার পোকা নড়ে উঠল।

কেষ্টদার সঙ্গে দীঘির পাড়ে বসে গল্প করতে করতে সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল। তারপর অন্ধকার একটু গাঢ় হলে একটা গাছতলায় যেখানে কেষ্টদা ওর নেশার জিনিস কলাপাতায় ঢেকে রেখে দিয়েছিল সেখানে এগিয়ে গেল। তপাইও গেল সঙ্গে। তারপর শুরু হ'ল পান ভোজনের পালা। একটু করে গলা ভিজোয় আর শোল মাছের ঝাল খায়। আঃ কি অপূর্ব।

দমভোর খেয়ে নেশায় চুর হল দুজনেই। কেষ্টদা হঠাৎ বলল—তপাই একবার যদি সেখানে?

—কোথায় ?

—ঘোগের বাসায়।

—ঘোগের বাসা ! সেটা আবার কোনখানে ?

কেষ্টদা রসিকতা করে বলল—হুঁ হুঁ। বুঝলি না তো। বাঘের গ্রামে ঘোগের বাসা। মানে সেই শ্মশান-ঘরে ভূতের ডেরায়।

—অর্থাৎ কাল যেখানে গিয়েছিলুম ?

—হ্যাঁ। আজ আমি আছি সঙ্গে। দেখিতো কে এসে দরজা জানালা খোলে। ঐ দরজার খিল যে খুলবে তার খাল আমি খেঁচে দেবো একেবারে। চলতো দেখি।

তপাই বলল—ঠিক বলেছ কেষ্টদা। আজ তো আর ঝড়-জল নেই। আজ দেখবো খিল কে খোলে। ভূত তো ভূত ভূতের বাপের নামও ভুলিয়ে দেবো আজ।

—চল তবে।

—চলো।

—তুই আমার পেছনে থাক। আমি সামনে। আমি ইঞ্জিন হই। তুই রেলের কামরা। আমি কু-ঝিক ঝিক শব্দ করতে করতে এগোব আর তুই ঘটাং ঘটাং করবি। ঠিক মনে করবি যেন আমরা মার্টিন কোম্পানীর রেলগাড়ি।

তপাই বলল—বহুৎ আচ্ছা। তুমি স্টার্ট দাও আগে।

কেষ্টদা নেশার ঘোরে খুব জোরে মুখ দিয়ে আওয়াজ করল—কু-উ-উ-উ-উক্। তারপর শুরু করল—ভকস্ ভক্, ভকস্ ভক্, ভক্ ভক্ ভক্ ভক্ ভক্ ভক্।

তপাইও তখন তপাইয়ের মধ্যে নেই। সে আনন্দে মশগুল হয়ে বলতে লাগল—ঘট ঘট ঘটাং ঘট ঘট ঘটাং।

নড়ে উঠল দুজনেই। তারপর চলা শুরু করল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর তেড়ে ছুটে। দু'তিন বার আছাড় খেয়ে পড়ল। তাতেও চেতনা নেই। আবার ছুটল।

www.arisumu.com

বাঁধের ধারের শ্মশান, দীঘির পাড় থেকে প্রায় মাইল খানেকের পথ। ওরা এইভাবে গিয়ে একসময় সেই শ্মশানঘরের কাছে পৌঁছুল। তারপর দুজনে সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শুরু করল ভূতেদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালাগালি। কেষ্টদা একে মিস্ত্রী মানুষ। তার ওপর নেশার ঘোরে তার মুখ দিয়ে এমন সব ভাষা বেরোতে লাগল যে তা বলার নয়। কেষ্টদার মুখ আর পায়খানা এক হয়ে গেল। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে গালাগালি করার পর একসময় কেষ্টদা থামল। তারপর বলল—দেখি বাবা ভূতের পো, কত মায়ের দুধ খেয়েছ তুমি। আমার নাম কেষ্ট মালিক। হিম্মৎ থাকে তো আমাকে আটকাও দেখি। বলেই দরজায় মারল এক লাথি।

দরজাটা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। কাজেই কেষ্টদার লাথিতে কিছুই হল না। বরং কেষ্টদাই পায়ে ব্যথা পেল একটু।

তপাই বলল—তুমি বুড়ো মানুষ। তুমি পারবে না কেষ্টদা। আমি কেমন লাথাই দেখো একবার। বলেই মারল এক লাথি।

কিন্তু না। সে লাথিতেও কিছু হ'ল না।

ওরা দুজনে তখন প্রাণপণ শক্তিতে গায়ের জোরে ঠেলতে লাগল দরজাটা। দরজা তবুও খুলল না।

কেষ্টদা বলল—আমার মনে হয় দরজাটা ভেতর থেকে খিল দেওয়া। কেউ ভেতরে বসে আছে নিশ্চয়ই। খিল দিয়ে বসে বসে মজা দেখছে।

ঠিক আছে। আমারও নাম কেষ্ট। দিচ্ছি দরজায় শিকল দিয়ে। বলে যেই না দরজায় শিকল দিতে যাবে অমনি দরজাটা আপনা থেকেই দুহাট হয়ে খুলে গেল।

ওরা দুজনে তখন খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দেখল একটা লোক গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

কেষ্টদা বলল—ঝোলো বাবা, একেবারে বৃন্দাবনের কেষ্ট ঠাকুরটি হয়ে ঝোলো ! তা এত যে লাথি মারলুম দরজায়, এত

দেরি করলে কেন খুলতে !

তপাই বলল—দেরি করুক আর যাই করুক। শেষ পর্যন্ত খুলতেতো হল।

কেষ্টদা বলল—তা হল। কিন্তু দেরি ও করল কেন ? এর জবাব ওকে দিতে হবে। এতক্ষণ ধরে ধাক্কাধাক্কি করার একটা-মেহনত নেই।

তপাই বলল—কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন রে ? বল কেন দেরী হল ?

কেষ্টদা বলল—না বললে ঐ দড়িতেই ঝুলতে হবে সারা জীবন। ওখান থেকে নামাচ্ছি না আমরা ! চেল্লে চেল্লে গলা ফেটে গেল। আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি !

তপাই বলল—ঠিক আছে। কথা না বলে না বলবে। অত গরজ আমাদের নেই। কেষ্টদা, চলো তো আমরাও জব্দ করি ব্যাটাকে।

কেষ্টদা বলল—কি করে জব্দ করি বলতো ?

তপাই বলল—ও যেমন ঝুলছে ওকে তেমনি ঝুলতে দাও।

—তারপর ?

—তারপর ? তারপর আমরা ঘরের বাইরে গিয়ে দরজায় শিকল দয়ে পালাই চলো। দেখি ও ব্যাটা কি করে ঘর থেকে বেরোয়।

কেষ্টদা বলল—হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস তুই। আমরা শিকল দিয়ে পালাই আর এ ব্যাটা ঘরে আটকে থাকুক। এই বলে দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে যেই না আসতে যাবে অমনি একটা কনকনে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে। সেই সঙ্গে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া। আর তার পরই পাশের একটা আম গাছের মোটা ডাল সশব্দে ভেঙে পড়ল কেষ্টদার মাথায়।

কেষ্টদা চিৎকার করে গাছের ডাল চাপা পড়ে ছট ফট করতে লাগল সেখানে।

তপাই অনেক চেষ্টা করল কেষ্টদাকে বাঁচাবার। কিন্তু পারল

না। ঐ দারুণ শক্ত মোটা ডালটাকে কিছুতেই নড়াতে পারল না সে। অগত্যা গ্রামে ফিরে লোকজন ডেকে এনে কেষ্টদাকে যখন উদ্ধার করল কেষ্টদা তখন মৃত।

সে রাতে প্রচণ্ড জ্বর এলো তপাইয়ের।

পরদিন ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাইয়ে ওর জ্বর একটু কম হলে পিসে মশায় তপাইকে নিয়ে সোজা চলে এলেন হাওড়ায় তারপর। ঘরের ছেলেকে ঘরে পেঁাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দায়মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন।

www.arisumu.com

www.arisumu.com

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

তপাইয়ের যে সময়কার ঘটনা নিয়ে আজকের এই গল্প তখন দেশের সর্বত্র চরম একটা বিশৃংখলা চলছে। খুবই ভয়াবহ দিন ছিল তখন। সেই সময় সম্ভবতঃ সেটা কোন ছুটির দিন। খেয়ে দেয়ে দুপুরে একটা গল্পের বই নিয়ে শুয়েছি এমন সময় দিদি এসে হাজির। কাঁদো কাঁদো মুখ। তাই চমকে উঠে বললাম—কি ব্যাপার! এমন অসময়ে তুমি হঠাৎ ?

—তোকে একবার আমার ওখানে যেতে হবে ভাই।

—কেন ? কি হয়েছে ?

—কাল রাত্রে পুলিশ এসে তপাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

—সেকি !

—হ্যাঁ। মিলিটারি দিয়ে কার্ফু করিয়ে রাতের অন্ধকারে গোটা পাড়াটাকে ঘিরে ফেলে সব বাড়ি থেকে বেছে বেছে একটা দুটো করে ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ! সেই সঙ্গে তপাইকেও।

দুঃসংবাদ নিঃসন্দেহে। অথচ করবার কিছুই নেই। ভ্রান্ত রাজনীতির এক উদ্‌ভ্রান্ত রূপ হঠাৎ এমনভাবে মোড় নিয়েছে যে যারা সত্যিকারের একটা সুস্থ চিন্তাধারা নিয়ে এই পথে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরাও দেখে শুনে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে মাতব্বরি করে দিয়েছিল সমাজ বিরোধীরা। ব্যক্তিগত রাগ রোষ এবং চুরি ডাকাতির সুবিধার জন্য অবাধ খুন জখম সুরু হয়ে গিয়েছিল। শেষকালে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে এপাড়ার লোক ওপাড়ায় যেতে পারত না। দিবা রাত্র গুলি আর বোমার শব্দে কান পাতা দায় হোত। কি রাজনৈতিক দলের লোক, কি পুলিশ, কি নিরপরাধ সাধারণ মানুষ, কে যে কখন কোন মুহূর্তে খুন হবে বা যত্র তত্র নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে জখম হবে তা কেউ

জানতেও পারত না। এমত অবস্থায় তপাইয়ের মতো ডানপিটে একটি ছেলেকে পুলিশ ধরবে তাতে আর আশ্চর্য কি। তবে এটুকু জানি তপাই শুধুই জনপিটে। ওকে যা সন্দেহ করা হচ্ছে তা ও নয় কিন্তু সেকথাই বা পুলিশকে এখন বোঝাবে কে ? মার খেতে খেতে পুলিশও এখন এমন মরিয়া যে তাদের কাছে যে যাবে সাফাই গাইতে তাকেই ঢুকিয়ে দেবে।

এই সমস্ত খারাপ পরিস্থিতি এবং গোলমালের জন্যে আমিও দীর্ঘদিন দিদির বাড়ির দিকে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দোকান বাজার অফিস আর ঘর ছাড়া কোন সময়ই বাইরে থাকতাম না। আর দিন রাত গুলি ও বোমার শব্দ শুনতে শুনতে পুলিশের পদধ্বনি প্রত্যাশা করতাম। কেননা আমার ভাইটি সবে এটুকু ডাগর হয়েছে। কাজেই ভয় ছিল কখন বলতে কখন ওকেই না ধরে। কেননা অল্প বয়সী ছেলে ছোকরা দেখলেই পুলিশ সন্দেহ করত এবং তাদের ধরে নিরে গিয়ে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করত।

যাই হোক। তপাই অ্যারেস্ট হয়েছে শুনে যেতেই হ'ল দিদির বাড়িতে আমার বাড়ি থেকে দিদির বাড়ির দূরত্ব একেবারে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। তবে এই এলাকাতেই এবং আধঘণ্টার হাঁটা পথে।

দিদির বাড়ি যেতেই জামাইবাবু আমাকে দেখে বললেন—কি ব্যাপার হে ! তোমার যে পাত্তাই নেই ?

—কি করে থাকবে ? এই দুর্দিন বেঘোরে মরার জন্যে কেউ ঘর থেকে বেরোয় ? কে কোথায় কখন কোনখানে ইনফরমার মনে করে রাস্তার মাঝখানে শহীদ করে দেবে তার ঠিক কি ?

…তা অবশ্য ঠিক। এদিকে কি কাণ্ড হয়েছে শুনেছ তো ? তোমার গুণধর ভাগনা দুটিকে তো কাল রাত্রে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। আমার তো ভাই হাত কাঁপছে ভয়ে। তোমার দিদিকে নিয়ে যাও। গিয়ে একটু দেখো ছাড়িয়ে আনতে পারো কিনা। নাহলে মিসা টিশা দিয়ে দেয় তো বারোটা বাজিয়ে দেবে। ছোট্—

কাটাকে আজ সকালে ছেড়েছে। কিন্তু তপাইকে ছাড়ে নি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—ছোটকা মানে! স্বপনকেও ধরেছিল নাকি ?

—কেন শোননি ?

—না। এই তো শুনছি। দিদি তো শুধু তপাইয়ের কথাই বলল।

—শোন তবে—এই বলে জামাইবাবু যা শোনালেন তা হ'ল এই—

রাত তখন একটা কি দুটো। হঠাৎ চারিদিক থেকে হ্যাট ফ্যাট শব্দ। আর তারপরেই দরজায় কড়া নাড়া। সেই সঙ্গে দমাদ্দম বুটের লাথি। ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলেই দেখি থুক থুক করছে সি, আর, পি। এবং এখানকার পুলিশ ও দারোগা।

মেজো দারোগা স্বয়ং এসেছিলেন। বললেন—ছেলেরা কোথায় ? বলেই পাশের ঘরে মানে যে ঘরে শঙ্কর, তপাই আর স্বপন শুয়েছিল সেই ঘরে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন।

শঙ্কর উঠে দরজা খুলতেই মেজো দারোগা ঠাস করে মারলেন ওর গালে এক চড়। একেই একটু দুর্বল ছেলে। তারওপর সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু শুয়েছিল বেচারি। চড় খেয়ে কঁকিয়ে উঠল তাই। চড় মারার পর মেজো দারোগা চিনতে পারলেন শঙ্করকে। বললেন—ও তুই! তোকে দরকার নেই। চিনি তোকে। চেনবার অবশ্য কারণও একটা ছিল। শঙ্কর তখন থানার পাশেই একটি গুঁড়ো চা পাতার দোকান দিয়েছিল। মেজো দারোগা বললেন—আর কে আছে ঘরে ?

তপাই একটি সর্ট প্যাণ্ট পরে শুয়েছিল। সেই অবস্থাতেই উঠে এলো।

মেজো দারোগা বললেন—আরে তপাইবাবু যে। এই কি ডাকাতি করে ফিরছ নাকি ?

তপাই বলল—দেখতেই তো পাচ্ছেন ঘুমোচ্ছিলাম। শুধু শুধু

আলফাল বকছেন কেন ?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক চড়। তারপর ওকে ঘর থেকে টেনে বার করে এনে কনস্টেবলদের হাতে তুলে দিতেই কোমড়ে দড়ি পরান

www.arisumu.com

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক চড়—

তারা। এরপর ঘরে ঢুকে বিছানার মশারি ওঠাতেই মেজো দারোগা স্বপনকে দেখতে পেলেন। ক্রোধান্ধ দারোগাবাবু চুলের মুঠি ধরে

টেনে আনলেন তাকেও।

স্বপন কেঁদে বলল—আমি কি করলুম! আমাকেও ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

—তুমি কিছু করনি বাবা। শুধু আমাদের এই বরযাত্রীদের দলে লোক একটু কম আছে বলেই তোমাকেও নিয়ে যাচ্ছি। আজ রাত্রিটা লক আপে থাকবে। তারপর কাল যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবো তোমাদের। এসো মাণিক এসো। বলে দুটো ছেলেকে সম্পূর্ণ বিনা দোষে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গেল ওরা। শুধু যে আমাদের বাড়ি তা নয়। সব বাড়ি থেকেই একটা দুটো করে নিয়ে গেছে এইভাবে। যাই হোক থানায় নিয়ে যাবার পর একজন কনস্টেবলের সঙ্গে স্বপনের চেনা ছিল তাই রক্ষে, সেই মেজো দারোগাকে বলে কয়ে ওকে ছাড়ান দেয়। কিন্তু তপাইকে ওরা কোনমতেই ছাড়বে না বলেছে। এখন একবার তুমি গিয়ে দেখো যদি ওকে ছাড়াতে পারো। কেননা তোমার তো অনেক সোর্স আছে। আর ভাগনা তোমারই।

আমি সব শুনে গুম হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

দিদি বললেন—শুধু কি ওদের ধরে নিয়ে যাওয়া? পুলিশের সেই মূর্তি যদি একবার দেখতিস তুই তো কি কথাই বলব তোকে। আমি কাঁদছিলুম বলে আমাকে পর্যন্ত যা তা কথা বলে গেছে।

—বলো কি! এত সাহস? পুলিশ ভেবেছে কি? নিরপরাধ ছেলেগুলো ঘরে শুয়ে আছে পুলিশ এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে। বাড়ির লোককে যা তা বলে যাবে। এটা মগের মুলুক নাকি? চল তো থানায়। দেখি কি ব্যাপার। প্রতিকার না হলে ডি, এম, কে জানাব। কমিশনারকে চিঠি দেবো এবং দরকার হলে মামলা করব।

রাগের মাথায় বললাম বটে কিন্তু মনে মনে জানি কিছুই করব না। কেননা এই বিশেষ সময়টিতে পুলিশের ওপর এমন ক্ষমতা দেওয়া আছে যে পুলিশ দরকার হলে পুলিশকেই গ্রেপ্তার করবে।

পাবলিক তো কোন ছাড়। কাজেই এই মুহূর্তে ওসব নয়। মনের রাগ মনে চেপে দিদি জামাইবাবু দুজনকে নিয়েই থানায় গেলাম।

মেজো দারোগা একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলেন আমাদের দিকে।

তপাই সহ প্রায় দশ বারোজন লক আপে রয়েছে দেখলাম।

আমরা সরাসরি ওসির ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

এক ভয়ঙ্কর চেহারার ও, সি বসে ছিলেন নিজের ঘরে। আমাদের দেখেই বাজখাঁই গলায় বললেন—কি চাই?

আমি একটু রাগত স্বরে বললাম—আপনাদের মেজো দারোগাবাবু কাল রাত্রে বিনা দোষে আমাদের ছেলেকে তার মায়ের কোল থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। আমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

—কি নাম?

—তপাই ব্যানার্জী।

—ওকে ছাড়া যাবে না।

—ওর অপরাধ?

—সে কথা আপনাদের বলা প্রয়োজন মনে করি না। আমি তখন দারুণ রেগে গেছি! বললাম—দেখুন, আপনারা কিন্তু বড্ড বাড় বেড়েছেন। আজকের এই বিশেষ সময়টিতে আপনাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে সেই ক্ষমতাকে আপনারা সম্পূর্ণ অন্যভাবে কাজে লাগাচ্ছেন।

আমার কথা শেষ হতেই ও, সি বোমার মত ফেটে পড়ে টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বললেন—বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান এখান থেকে। আপনাদের ছেলেকে আমি মিসায় দেবো। আর এক সেকেণ্ড এই ঘরে থাকলে আপনাকে পর্যন্ত অ্যারেস্ট করব আমি!

ভয়ে এবং অপমানে আমারও মুখ লাল হয়ে উঠেছে তখন। বললাম—এটা তো খুব সোজা কাজ। আমি আপনার ঘরে দাঁড়িয়ে

আছি আপনার লোক এসে আমাকে অ্যারেস্ট করবে। তবে আমার সঙ্গে কিছু করবার আগে আপনি কিন্তু একটু ভেবে দেখবেন। আমি হচ্ছি 'অমুকের' লোক। অ্যারেস্ট করে বেশিক্ষণ কিন্তু আপনি রেখে দিতে পারবেন না আমাকে। আমি ঠিক বেরিয়ে যাব।

ও সি এবার শান্তভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর ভদ্রভাবেই বললেন—বসুন।

দিদি জামাইবাবু এবং আমি তিনজনেই বসলাম।

—উনি কে হন আপনার? যার নাম করলেন?

—কেউ না। তবে আমি তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। আমাকে তিনি এতই ভাল ভাবে চেনেন যে আমি আশা রাখি আমি কখনো এই ধরনের কোন বিপদে পড়লে তিনি নিশ্চয়ই আমার জন্য কিছু অন্তত করবেন। কারণ তিনি জানেন আমি কোন গর্হিত কাজ করতে পারি না।

—আপনার নাম?

আমি নাম বলে পরিচয় দিলাম।

ও, সি হেসে বললেন—অ। তাই বলুন। আপনি তো মশাই-এ অঞ্চলে খুব পপুলার। আমার নাতিরা আপনার লেখা পেলে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। আর সত্যিকথা বলতে কি সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের প্রতি আমার নিজেরও একটু দুর্বলতা আছে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

সেই ভয়ঙ্কর মানুষটি যেন নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে মুখে বিনীত এবং ভদ্র এক মানুষের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। বললেন আসলে, কি জানেন, সকাল থেকেই ঝামেলা। এইসব ছেলেগুলোর বাড়ির লোকেদের আবেদন নিবেদন এবং সুপারিশের ঠ্যালা সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম—দেখুন, অন্যের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না। তবে আপনাদের মেজ দারোগাবাবু কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে

সম্পূর্ণ নিরপরাধ দুটি ছেলেকে তুলে এনেছেন কাল। একজন ছাড়া পেয়েছে। আর একজনের জন্যে অন্যরকম ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলাম। এমনিতে ও ছেলেটি একটু ডানপিটে। তবে ওকে যা সন্দেহ করছেন আপনারা ও কিন্তু তা নয়। সব চেয়ে দুঃখের কথা রাস্তাঘাটে কোন দুরন্তপনার সময় ওকে ধরলে আমাদের কিছু বলার ছিল না। তবে কিনা যে ছেলে রাত্রিবেলা ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে তাকে এইভাবে ধরে এনে আটকে রাখার পিছনে যে কি যুক্তি থাকতে পারে আপনাদের তা বুঝলাম না। শুধু তাই নয়। আমার দিদি কাঁদছিলেন বলে আপনাদের মেজবাবু তাঁকে পর্যন্ত যা তা কথা বলে এসেছেন।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এ ব্যাপারে আমি মেজবাবুকে সতর্ক করে দেব। তবে আপনার অনেক অভিযোগ তো আমি শুনলাম। এবার আপনি অনুগ্রহ করে আমার দু'একটা কথা শুনবেন কি?

—বলুন।

—এই যে চারিদিকে এত খুন জখম বোমাবাজি অবাধে চলছে, এত ভয়ের ব্যাপার ঘটছে এগুলো এইভাবেই চলুক এই কি আপনারা চান?

—না।

—তাহলে এইগুলো রোধ করবার জন্য প্রশাসনকে যদি কোন কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয় তাকে নিশ্চয়ই আপনারা সমর্থন জানাবেন?

—জানাব। তবে রাতের অন্ধকারে কিছু ঘুমন্ত নিরপরাধ ছেলেকে তুলে নিয়ে এসে তাদের নামে গোটাকতক মিথ্যে কেস লিখিয়ে যদি সেই ব্যবস্থা নেন তাহলে কিন্তু সমর্থন জানাতে আপত্তি আছে।

—ওঃ হোঃ। আপনাকে নিয়ে পারা গেল না মশাই। আপনার প্রসঙ্গেও আমি আসছি। আপনার তাহলে পুরোপুরি ধারণা যে আমরা নিরীহ ছেলেগুলোকে ধরে নিয়ে এসে পেটাই বা তাদের

বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস দিই।

—সবাইকে নাহলেও কারো কারো বেলায় দেন।

—যেমন আপনার ভাগনের বেলায় হয়েছে। এই তো?

—হ্যাঁ।

—আপনার বাড়ি কোথায়? শুনেছি আপনি শিবপুরের দিকে থাকেন।

—আমি মধ্য হাওড়ায় থাকি।

—বাড়িতে কে কে আছেন আপনার?

—মা বাবা ভাই।

—ভাই কি করে? বয়স কত?

—স্কুলে পড়ে। তেরো চোদ্দ বছর বয়স।

—পুলিশের খাতায় নাম আছে?

—তার মানে! ঐটুকু ছেলের শুধু শুধু পুলিশের খাতায় নাম থাকতে যাবে কেন? তাছাড়া আমরা তাকে যথেষ্ট চোখে চোখে রাখি!

—খুব ভাল কথা। আমি বলতে চাইছিলাম এই যে আপনার ভাগনার মতো তাকেও কোনদিন পুলিশ রাত্রিবেলা তুলে নিয়ে যায় নি তো?

—এখনো পর্যন্ত যায় নি।

—সেকি! আপনি যে এলাকায় থাকেন ওটা তো এখন রীতিমতো বিপজ্জনক এলাকা। ঐ এলাকা থেকে প্রতিদিনই খুন জখম আর বোমাবাজির রিপোর্ট আমরা পাই। এমন কি দিনমানেও ঐ অঞ্চলে পুলিশের গাড়ি ঢুকতে পারে না। ওখান থেকে প্রায় রাত্তিরেই কার্ফু করিয়ে বহু ছেলেকে ধরে আনা হয়। অথচ আপনার ভাই ধরা পড়েনি এ ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!

ও, সি কি বলতে চাইছেন কিছু বুঝলাম না। তবু বললাম—না, এখনো পড়েনি।

ও, সি হেসে বললেন—যাক, পুলিশ তাহলে একটা ভাল

কাজও করেছে যে আপনার নিরীহ ভাইটাকে ধরে নি। পুলিশ তহলে মাঝে মাঝে এরকম ভুলও করে? এবার সত্যি করে বলুন তো আপনি যে পাড়ায় থাকেন সেখান থেকে যে সব ছেলেদের পুলিশ ধরে নিয়ে আসে তারা ঠিক কি রকমের ছেলে? সত্যি কথা বলবেন।

আমি আর উত্তর দিতে পারলাম না।

—আপনি আরো একটা কথার উত্তর দিন আমাকে। আপনি তো মশাই আপনার ভাগনাকে ছাড়াবার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে এসেছেন এখানে কিন্তু আপনি কি জানেন আপনার ভাগনাটি কি মাল?

—আমি তো আগেই বলেছি আমার ভাগনা দুরন্ত দামাল। ভয়ানক ডানপিটে। কিন্তু আপনারা যা ভাবছেন ও তা নয়।

ও, সি এবার কঠিন গলায় বললেন—তাহলে আমি ধরে নেবো আপনি চাকরি বাকরি করেন না। এবং বাড়িতেও থাকেন না। দিনরাত শুধু দিদির বাড়িতে থেকে আপনার এই আদরের ভাগনাটিকে পাহারা দেন। তাই না?

আমি নীরব।

ও, সি এবার আমার দিদি জামাইবাবুকে বাইরে যেতে বলে আমাকে বললেন—শুনুন, আপনার নিরীহ ভাগনাকে কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে ধরা হয় নি। তবুও তাকে রাত্রিবেলা ঘুম থেকে তুলে এনে কেন লক আপে রাখা হয়েছে জানেন? এই দেখুন, বলে ড্রয়ারের ভেতর থেকে একখানি 'গণ অভিযোগ পত্র' বার করে আমার সামনে মেলে ধরলেন।

তাকিয়ে দেখলাম এই অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অভিযোগ পত্রের মাধ্যমে কিছু ছেলেকে অবিলম্বে মিসায় গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাক্ষরকারীরা সকলেই আমার পরিচিত। এই অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এনারা। এঁদের নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য পুলিশের নেই। আর সেই নামের তালিকায় আমার দুটি

ভাগনারই নাম জ্বল জ্বল করছে।

আমার হাত থেকে কাগজটা খসে পড়ল।

ও, সি বললেন—এর পরও এইসব ছেলেদের গ্রেপ্তার না করে আমাদের উপায় আছে? আমরা জন-সাধারণের সাহায্য চাইছি। তাঁরা এই নামগুলি আমাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। তবু দেখুন আপনার দুটি ভাগনেকে ধরে এনেও একটিকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ ওকে ভুল করে ধরা হয়েছিল। কেননা এতে যে স্বপন ব্যানার্জীর নাম রয়েছে ও সে স্বপন নয়। সে ছেলেটি এখন ফেরার। এরপর একটু থেমে বললেন—দেখুন, আমরা পুলিশের চাকরি করি বটে কিন্তু আমাদেরও ছেলে মেয়ে আছে। কাজেই গোটা কতক নিরীহ ছেলেকে ধরে নিয়ে এসে আমরা অযথা পেটাই, তাদের নামে মিথ্যে কেস লেখাই এগুলো কিন্তু ঠিক নয়। তবে কোন ভীড় ভাট্টায় বা কোন গোলমালের মুখে যে দু'চারটে নিরীহ ছেলে বা লোক ধরা পড়ে না তা নয়। পরে উপযুক্ত প্রমাণ পেলে আমরা তাদের ছেড়েও দিই।

আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—তাহলে আমার ভাগনার ব্যাপারে কি ঠিক করলেন?

—এখনো কিছু ঠিক করিনি। আপনিই বলুন না কি করা যায়?

—কি বলি বলুন? শুধু করযোড়ে আপনার কাছে আমি একটিই অনুরোধ করছি। অনুগ্রহ করে ওকে আপনি এবারের মতো ছেড়ে দিন। ওকে আমরা নজর বন্দী করে রাখব। এরপর ভবিষ্যতে যদি আপনি কখনো ওর নামে কোন অভিযোগ পান বা কোন কারণে ও গ্রেপ্তার হয় তাহলে আমি অন্তত ওর ব্যাপারে আর আসব না।

—ভবিষ্যতে নয়। আপনি এখনো এর ব্যাপারে থাকবেন না। আপনি তো এই এলাকার বাইরে থাকেন। কাজেই আপনি জানেন না আপনার এই ভাগনাটি কি ডেঞ্জারাস। তবে আপনার অনুরোধ

আমি রাখব। এবং আজ ওকে ছেড়েও দেবো। কিন্তু একটি সর্তে।

—বলুন কি সর্ত?

—এখান থেকে ছেড়ে দেবার পর টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে ওকে আপনারা হাওড়া কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দেবেন। যদি তা না করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই ভাগনাটিকে আর জীবিত দেখতে পাবেন না। কেননা ওর দলের ছেলেরা জেলে পচবে আর ও খুঁটির জোরে বুক ফুলিয়ে পাড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াবে তা ত হয় না। ওরাই ওকে শেষ করে দেবে। কাজেই এখান থেকে আপনারা ওকে সরিয়ে নিয়ে যান। ওকে ভালো হবার শেষ সুযোগ করে দিলাম আমি। যদি এর অন্যথা হয় তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। আমি নিজেও এত খেপে আছি ওর ওপর যে এরপর রাস্তায় ঘাটে যেখানে দেখব আমি ওকে সেখানেই গুলি করে মারব। আর ধরে এনে লক আপে রাখব না। এবার যা ভালো বোঝেন তাই করবেন। বলেই বেল বাজিয়ে লোক ডাকলেন।

একজন কনস্টেবল এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

—তপাই ব্যানার্জীকে ছেড়ে দাও। তবে এখুনি নয়। সন্ধ্যের পর। তারপর আমাকে বললেন—দিনের বেলা নিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। রাত্রিবেলা ওর বাবাকে বলবেন ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতে। আর ওর সম্বন্ধে পাড়ায় কোন আলোচনা করবেন না। এখানেও কেউ টের পাবে না ও ছাড়া পেল কি কোথায় গেল। যান।

আমরা নীরবে থানা থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর দিদির বাড়িতে গিয়ে খুব একচোট ঝগড়া করলাম দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে। রেগে মেগে বললাম—তোমরা তোমাদের নিজেদের ছেলেকে কনট্রোল করতে পারো না, ছেলেরা কি করে বেড়াচ্ছে না বেড়াচ্ছে খোঁজ খবর রাখো না, অযথা আমাকে ডাকিয়ে এনে কেন অপদস্থ করালে?

দিদি জামাইবাবু দুজনেই মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জামাইবাবুই বললেন—আচ্ছা, আমাদের তখন বাইরে আসতে বলে ওসি কি বলছিলেন তোমাকে ?

সে কথা আপনাদের বলা যাবে না। তবে উনি এমন কিছু আমাকে দেখিয়েছেন যাতে বুঝতে পারলাম আপনাদের ছেলেকে বিনা দোষে পুলিশ ধরে নি।

দিদির মুখ থেকে অস্ফুটে শুধু বেরিয়ে এলো—সেকিরে !

—হ্যাঁ। খুব সাবধান।

এরপর আমার ছোট ভাগনা স্বপনকে ডেকে নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। ঘরের দরজা বন্ধ করে মামা ভাগনা মুখোমুখি হলাম। অনেক বুঝিয়ে বাঝিয়ে বকে ঝকে মোচড় দেবার পর স্বপন যা বলল তার অর্থ হ'ল এই, ওদের পাড়ার ধোকাদা, মানে যিনি রেগে গেলে হুট করতেই গায়ে হাত তোলেন। অর্থাৎ ঠ্যালাওলা রিক্সাওলার ওপর যাঁর হাতের কাজের আধিপত্যটা বেশি তাঁরই নির্দেশে ওরা রাত্রি-বেলা দেওয়ালে গিয়ে লেখালিখি করে। তপাই এবং অন্যান্যরা লেখে। স্বপন এবং ওর সমজুটিরা পাহারা দেয়। তারপর ধোকাদার দল যখন বেপাড়ার কারো ওপর হিস্যা নেন তখন সেইসব অস্ত্রশস্ত্র তপাই এবং দলবল গোপন স্থানে সরিয়ে রাখে। আর—

এই পর্যন্ত শুনেই কানে হাত চাপা দিলাম। বললাম—ব্যস। আর কিছু বলতে হবে না। বুঝে গেছি। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আসল সত্য প্রকাশ করলাম।

দিদি শিউরে উঠে বললেন—বলিস কিরে ! কিন্তু তুই বিশ্বাস কর ভাই আমরা এসবের কিছু জানি না। রাত্রিবেলা ওরা তিনটেতে ও ঘরে শোয়। মাঝরাতে কখন যে চুপি চুপি ঘুম থেকে উঠে ঐসব করে তা কে জানত। ভাগ্যিস তুই চেপে ধরলি নাহলে কিছুই জানতাম না।

আমি বললাম—ওসব জানাজানির কথা থাক। তপাইয়ের

ব্যাপারে এবার কি ঠিক করলে বলো ? ছেলের গুণ তো বেরলো' আর পুলিশের বক্তব্য শুনলে। সময় মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। তার ভেতরে যা করবার করে ফেল।

—কি করি বলতো ? আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। ওকে যেখানে পাঠাব ও তো সেখানেই উপদ্রব করবে। সেবার পিসির বাড়ি পাঠালাম, সেখানে গিয়েও যা করে এলো তাতে সেখানেও আর ঠাঁই হবে না। তাই ভাবছি এবার ওকে দাঁইহাটে মীনার বাড়ি পাঠাই। মীনা দিদির বড় মেয়ে। ঐখানেই ও জব্দ। কেননা কুটম বাড়ি। বেশি বাড়াবাড়ি করতে সাহস করবে না। পরে একটু ভেবে চিন্তে দেখব আর কোথায় ওকে পাঠানো যায়।

—তাই দেখো। তবে আপাততঃ ওকে দাঁইহাটেই পাঠাও। কাল খুব ভোর ভোর উঠে ফার্স্ট ট্রেনেই পাঠিয়ে দাও ওকে। আর একটা কথা। ভুলেও কারো কাছে যেন গল্প করো না ও ছাড়া পেয়েছে বলে।

জামাইবাবু বললেন—ওকে নিয়ে যাবার তাহলে কি হবে ? কে রেখে আসবে ওকে ?

—কে আবার ? আপনার ছেলে আপনিই নিয়ে যাবেন। আমি ওসবের ভেতরে নেই। এই বলে বাড়ি ফিরে এলাম আমি।

মনে মনে দুঃখও পেলাম খুব। তপাইটা শেষকালে এই লাইনে চলে গেল !

কোন কোন মানুষ আছে যাদের জন্ম লগ্ন এমন কিছু গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান থাকে যাতে তারা আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ পায়। বিনা দোষে দোষি হয়। অন্যের বোঝা নিজে বয়। কিন্তু তপাইয়ের জীবনে এমন কিছু গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব আছে যার ফলে ও কক্ষচ্যুত হয়ে বিপথে চলে গেলেও সেই গ্রহের প্রভাব ওকে সব সময় বিপদ মুক্ত করে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি দিনের পর দিন রক্ষা করে যায় ওকে। বাস্তব যতই বিপজ্জনক ভাবে ওর সামনে এসে উপস্থিত হোক না কেন সেই গ্রহচক্র তার ধারালো

চাকায় সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে ওকে বাঁচাবেই বাঁচাবে। নাহলে যেভাবে ওকে আমি থানা থেকে বার করে এনেছি সেই ভাবে সেই সময়ে একটা ছেলেকে বার করে আনা অত সহজ ছিল না।

যাই হোক। তপাই দাঁইহাটে গিয়ে ওর দিদির বাড়িতে আশ্রয় পেল। মা বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আত্মীয় স্বজনরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চারিদিকের এই গোলমালের বেড়াজাল থেকে ছেলেটাকে যে বার করে আনা গেল এই যথেষ্ট। ছেলে পুলের এমনি দুরন্তপনা সহ্য হয় কিন্তু রাজনীতি না করে রাজনীতির তকমা আঁটা বদমায়েসি ভয়ের কারণ হয়ে যায় কিনা। বিশেষ করে এই রকম একটি দুঃসময়ে।

তপাই চলে যাবার প্রায় মাস তিনেক পরের কথা। ছুটির দিনের এক দুপুরে আমি কুন্তীঘাট যাচ্ছিলাম। কুন্তীঘাট হ'ল হাওড়া কাটোয়া লাইনের একটি স্টেশন। ব্যাণ্ডেলের পর বাঁশবেড়িয়া। তারপর ত্রিবেণী। তারপর কুন্তীঘাট। সেখানে নয়াসরাই খেয়াঘাটে কুন্তী ও গঙ্গার মিলন স্থলের পাশে উঁচু ডাঙায় দেড় কাঠা জমি কিনে আমি একটি ছোট বাড়ি তৈরী করেছিলাম। মাঝে মধ্যে ছুটি ছাঁটা পেলেই আমি সেখানে যেতাম। সেদিনও তাই যাচ্ছি। দুপুরবেলা বারহাড়োয়া প্যাসেঞ্জারে বসে আছি। ট্রেন ছাড়তে তখনো একটু দেরি আছে। এমন সময় জানালার ধার থেকে সেই পরিচিত গলার স্বর শুনতে পেলাম—ও মামা!

চেয়ে দেখি তপাই। দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল। বিস্মিত হয়ে বললাম—কি ব্যাপাররে! তুই এখানে?

—কোথায় যাচ্ছেন? কুন্তীঘাট?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুই এখানে কি করছিস?

—কিছু করিনি। দাঁইহাট যাবো বলে এসেছি।

—তোকে না হাওড়ায় আসতে মানা করেছি। ফের এসেছিস তুই? কবে এসেছিলি?

—আজই ভোরে এসেছিলুম।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তার ওপর দিনের বেলায়। পাড়াশুদ্ধু লোক দেখল তো? সব জানাজানি হয়ে গেল।

—পাড়ায় যাই নি তো আমি।

—সেকি! বাড়ি যাস নি? কোথায় এসেছিলি তবে?

—এইখানেই একটু কাজে এসেছিলুম। তাছাড়া বাড়ি থেকে যখন তাড়িয়েই দিয়েছে তখন কোন মুখে আর সেখানে যাব?

—বাড়ি থেকে তোকে তাড়িয়ে দেবে কেন? তুই কি জানিস না যে কাজ তুই করেছিস তারপর তোকে সরানো ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

তপাই হেসে বলল—এখনো তো কিছুই করিনি মামা। ঘরে থেকে কিছুই করা যাচ্ছিল না। বিপ্লব সুরু হয়ে গেছে। জমানা বদলে যাচ্ছে। সারা দেশে আগুন জ্বলবে এবার।

আমি তো লাফিয়েই উঠলাম প্রায়—ও সর্বনাশ। তুই বুঝি বিপ্লবী হয়েছিস? তাই বল। তা বাবা জেনে রাখ, এইভাবে বিপ্লবকে ডেকে আনা যায় না। বিপ্লব যখন আসে তখন আপনা থেকেই আসে। যে সব প্রতারকরা তোদের এই সব শিখিয়েছে আসল সময়ে দেখবি তারা সবাই গা ঢাকা দেবে। মাঝখান থেকে মার খেয়ে মরবি তোরাই।

তপাই বলল - না মামা, যা ভাবছেন আপনি তা নয়। যে মন্ত্রে আমরা দীক্ষা নিয়েছি তাতে একের জন্যে অন্যে আমরা জীবন দিয়ে দেবো। সবাই আমরা এক মন এক প্রাণ।

—তাই নাকি? তা বাবা যেদিন তুমি লক আপে ছিলে সেদিন তোমার এক মন এক প্রাণরা কোথায় ছিল বাবা? সেদিন তো কাউকেই দেখিনি। আমার যতদূর মনে পড়ে আমিই তোমাকে পুলিশের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা বোতল এগিয়ে এলো আমার মুখের কাছে—মামাবাবু কোকোকোলা!

চমকে উঠলাম—কে!

—আমি ডিকে। চিনতে পারছেন না ?

—ডিকে ! একি অবস্থা তোর ? কবে ছাড়া পেলি তুই ?

—ছাড়া পাইনি। সেন্ট্রাল জেলে ছিলুম। কাগজে দেখেন নি একদিন জেল ভেঙে কিছু কয়েদি পালিয়েছিল। আমিও ছিলুম তাদের দলে।

বুকের ভেতরটা ঢিপ করে উঠল।

তপাইয়ের বন্ধু ডিকে। জগদ্ধাত্রীর মুণ্ডু কাটার জন্য এই অঞ্চলে সে বিখ্যাত হয়ে আছে।

এই বছরই জগদ্ধাত্রী পুজোর এক হপ্তা পরে স্থানীয় একটি ক্লাবে গিয়ে ঝামেলা পাকায় ও। সঙ্গে তপাইও ছিল। তবে পুরোভাগে ছিল ডিকেই স্বয়ং। ক্লাবের সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে ওরা বলেছিল ওদের পুজোর চাঁদার টাকা থেকে কিছু টাকা দিতে। কিন্তু সেক্রেটারী তাতে রাজি হয়নি। বলেছিল—মায়ের পুজোর টাকা থেকে নেশার খোরাক জোগাব তোদের ? বলতে লজ্জা করল না ? যা বেরিয়ে যা এখান থেকে।

ডিকে ফোঁস করে উঠে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলেছিল—খবরদার বলছি। রঙ নিয়ে কথা বলবি না। একেবারে পুরোপুরি বিষ-খোবরা ছেলে আমি। যদি খেপি তো এই মা জগদ্ধাত্রী বাঁচাতে পারবে না তোকে।

সেক্রেটারীও ক্রুধ্ব প্রত্যুত্তর দিয়েছিল—ঠাকুর দেবতা নিয়ে ছেলে-খেলা ? এই মা তোর থেকেও অনেক বেশি বিষখোবরা বুঝলি ?

ডিকে আরো রেগে বলল—ছেলেখেলা আমি করছি ? না তোরা করছিস ? কবে পুজো হয়েছে আর কতদিন ঠাকুর রেখেছিস। দশ দিনের ওপর হয়ে গেল সে খেয়াল আছে ? পরের টাকা নিয়ে ফুর্তি মারবি তোরা আর আমরা চাইলেই যত দোষ না ? শিগগির টাকা দিবি। নাহলে এক্ষুনি প্যাণ্ডেলে আগুন ধরিয়ে দেবো।

—তাই নাকি ? যদি মরবার ইচ্ছে থাকে তাহলে এসব করবি।

—কে মারবে ? তোদের এই মা ? বেশ। আমি তো মায়ের

বখাটে ছেলে। দেখি মা আমায় কি করে মারে। তোদের মা যদি সত্যিই থাকে তাহলে আমাকে রুখবে। আর যদি ওটা স্রেফ কাদা-

www.arisumu.com

ভোজালিটা সেক্রেটারীর মুখের কাছে নাচাতে নাচাতে ডিকে বলল—

মাটির পুতুল হয় তাহলে কিছুই করতে পারবে না আমার। মা যদি সত্যিই থাকত তাহলে এতদিনে তোদের আর রক্ষে রাখত না।

বুঝলি ? বলেই তপাইকে বলল—তপাই ! যন্তরটা নিয়ে আয় তো।

তপাই অমনি ছুটে গিয়ে মোড়ের মাথার চায়ের দোকান থেকে লুকিয়ে রাখা ভোজালিটা এনে হাজির করল।

পূজা কমিটির সেক্রেটারী হাঁ হাঁ করে উঠল—এই ! এই ! কি হচ্ছে কি ? খুব খারাপ হবে কিন্তু।

কিন্তু কাদের বলা ?

তপাই ভোজালিটা ডিকের হাতে দিতেই ডিকে পাশেই পড়ে থাকা একটা মই কুড়িয়ে এনে জগদ্ধাত্রীর বুকে ঠেকিয়ে চড় চড় করে উঠে গিয়ে মারল এক কোপ।

ডিকের খড়্গাঘাতে দেবীর মস্তক ভূলুণ্ঠিত হ'ল।

তারপর সেই ভোজালিটা সেক্রেটারীর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে নাচাতে নাচাতে ডিকে বলল—কিরে ব্যাটা দেখলি তো ? ঐ কাদা মাটির পুতুলটার কি অবস্থা করলুম। পারল আমার কিছু করতে ? ওর ভেতরে মা থাকলে নিশ্চয় মা-ই আমাকে কেটে ফেলত।

সেক্রেটারী রাগে দুঃখে এবং ক্ষোভে গায়ের জোরে ডিকের তপপেটে মারল এক লাথি। কিন্তু একজন পেশাদার মার খাইয়ের ঐ লাথিতে কি হবে ? কিছুই হ'ল না তাই। উল্টে ডিকেই ওর পেটের মধ্যে গুঁজে দিল ভোজালিটা।

তারপর হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।

ডিকেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। এবং বিচারে ওর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। সেই ডিকে এখন জেল ভেঙে পালিয়ে এসে একেবারে আমার সামনে।

আমি ডিকের দিকে তাকিয়ে বললাম—আমি তো বোতলের জল খাই না বাবা।

ডিকে অবাক হয়ে বলল—এ তো কোকোকোলা।

—না বাবা। হাওড়া স্টেশনের কোকোকোলা আর ড্রেনের জল একই ব্যাপার।

—সেকি মামা ! এত লোক খাচ্ছে !

এমন সময় আর এক মক্কেল এসে হাজির হ'ল—কি মামু, ভালো তো ?

—তুই কেরে ? তোর মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছে।

—আমি শান্ত। একবার তপার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলুম মনে নেই ? সেই সরস্বতী পুজোর সময়। আপনি কত গল্প শোনালেন।

—তা কি ব্যাপার বলতো ? তোরা সব যাচ্ছিস কোথায় ?

—আমরা দাঁইহাট যাচ্ছি।

তপাই বলল—মামা, মাকে যেন বলবেন না। ওখানে গিয়ে পুরোপুরি একটা গ্যাঙ তৈরী করে ফেলেছি। আমি এদের নিয়ে যাব বলে এসেছিলাম। আপনি একদিন আসুন না আমাদের ওখানে ? এই বলে একটা ব্যাগ এনে আমার হাতে দিয়ে বলল—এটা আপনার সিটের নিচে লুকিয়ে রাখুন তো মামা।

—কি ওটা !

—ওতে মাল মশলা আছে। পেটোর মশলা। দারুণ একটা মওকা পেয়েছি মামা।

—কিন্তু এটা আমার এখানে কেন বাবা ? কোন বিস্ফোরক কিছু নেই তো ?

—না না। ভয় নেই। আসলে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে বোধহয় কারো নজরে পড়ে গেছি আমরা। মনে হচ্ছে কোন আই বির লোক ফলো করছে আমাদের।

—সে কিরে ! টিকিট কেটেছিস ?

—কি হবে টিকিট কেটে ? টিকিট আমরা কাটি না।

—কেন কাটিস না ? একে তোদের রেকর্ড খারাপ। তার ওপর যদি বিনা টিকিটে ধরা পড়িস তাহলে কিন্তু কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে।

—মামা, আমরা তৈরী। কোন রকমে ব্যাণ্ডেলটা যদি পার হ'তে

পারি তাহলে আর আমাদের পায় কে ? তারপর যে আমাদের টিকিট চাইতে আসবে তাকে আর ঘরে ফিরতে হবে না। অবশ্য চায়ও না কেউ। চেকাররাও চেনে আমাদের। চোখের চাউনি দেখলে পালায় তারা।

—সে তো তোদের ডেরায় ! এর মধ্যে যদি ধরা পড়িস ?

—এইখানটাই একটু খারাপ জায়গা। কোনরকমে ব্যাণ্ডেলটা পার হতে পারলে—।

—সে যাক। কিন্তু যখন নিজেরাই সন্দেহ করছিস তোরা নজর-বন্দী হয়ে গেছিস তখন এই মালটা কি আমার ঘাড়ে না চাপালেই নয় ? আমাকেও যদি তোদেরই লোক মনে করে ধরে, তখন ?

—এঃ। ধরলেই হ'ল নাকি ? আসলে আমাদের হাতে ঝোলা ঝুলি দেখলেই সন্দেহ করবে। কিন্তু এখানে থাকলে টেরও পাবে না কেউ। আপনি আছেন তাই। নাহলে অন্য ব্যবস্থা করতাম।

একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

ভাগ্য ভাল তাই ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত কেটে গেল নিরাপদেই। ট্রেনের যাত্রাপথে দুপাশের দৃশ্য দেখতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম সেই তপাই এই কয়েক মাসের মধ্যে কি থেকে কি হয়ে গেল। বেশ তো মড়া পুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। কে বলেছিল ওকে এইসব করতে ? কে বলেছিল ওকে অন্ধকারে দেওয়ালে লিখতে ? কিন্তু কপালের লেখা। খণ্ডাবে কে ?

যাই হোক। ব্যাণ্ডেল পেরোতেই তপাই এসে বলল—তারপর মামু ! খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তো ? আর ভয় নেই। এবার আমরা আমাদের রাজত্বে ঢুকে পড়েছি। এ গাড়ি এবার আমাদের।

আমি বললাম—খুব ভালো কথা। তোমরা এবার রামরাজত্ব করো বাবা। আমি নেমে পড়ি। আমার ষ্টেশন এসে গেছে।

কুন্তীঘাট আসতেই আমি নেমে পড়লাম। তারপর ঘুরে বেরিয়ে রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার পথে একবার দিদির বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে এলাম তপাইয়ের বৃত্তান্ত। দিদি তো শুনেই লাফিয়ে উঠলেন

'সেকিরে' বলে। গালে হাত দিয়ে বললেন—আবার ঐ মুখপোড়া-গিয়ে জুটেছে !

আমি বললাম—স্বচোক্ষে দেখে এলাম আমি।

দিদি সেই রাত্রেই ছুটলেন দাঁইহাটে। অনেক বারণ করলাম রাত ভিত ট্রেন জার্ণি করে না যেতে। কিন্তু হাজার হলেও মায়ের প্রাণ তো। রাতের প্যাসেঞ্জারে চেপে একাই চললেন। পেঁছুতে সেই কাল ভোরবেলা। তবু চললেন।

এবার তপাই প্রসঙ্গে আসা যাক।

দাঁইহাটে এসে প্রথম কিছুদিন তপাই চুপচাপই ছিল। তারপর গ্রামের আনাচে কানাচে ঘুরতে ঘুরতে এখানকার যে সব লাইনের ছেলে ছিল তাদের দলে ভিড়ে গেল। দেওয়াল লিখন, বোমাবাজি, প্রকাশ্য দিবালোকে ভোজালি পাইপগান ইত্যাদি নিয়ে রাবণের মতো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো, কোন কিছুই বাদ দিল না।

আবার সেই পুরাণো ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

খাওয়া দাওয়া আর টো টো করে ঘোরা। কোনদিন ঘরে ফেরা বা না ফেরা। সবই ওর ইচ্ছা মাফিক চলতে লাগল। এখানেও সেই একটু আধটু বদমায়েসী করতে করতে একেবারে পাক্কা বদমাস হয়ে উঠল। আবার সেই মস্তানি। জ্বালাতন পোড়াতন। লোকের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করল। কাজেই কেউ আর ভয়ে ঘাঁটাল না ওকে। আর সেই সুযোগে আরো বেড়ে উঠল ও। লাইনের ছেলেদের পাল্লায় পড়ে আবার এক বাস্তু ঘু ঘু তৈরী হ'ল। দিদির বাড়ি নাম কা ওয়াস্তে থাকা। প্রতি বাড়ি থেকে দলের ছেলেদের জন্য পালা করে খাবার দাবার যা আসে তাই খায়। হোটেল, ক্যানটিন, খাবারের দোকান আশ পাশে যেখানে যত ছিল সর্বত্রই ফ্রি। মাঝে মাঝে তোলার টাকা আসে। সাধারণতঃ দোকানদার এবং বাজারের ব্যাপারীরাই তোলার টাকা দিত। সেই টাকায় ঢালাও হাত খরচা চলত। কি সুখের জীবন। স্বর্গ যেন হাতের মুঠোয় নেমে এলো।

এখানকার ছেলেরা পেটো বাঁধায় খুব একটা পোক্ত ছিল না।

তপাই বলল—আরে আমি তো আছি। পেটো বাঁধার ওস্তাদ কারিগরদের নিয়ে আসছি আমি।

ছেলেরা বলল—তাই নিয়ে এসো গুরু। ওদের সব খরচ খরচা আমরাই দেবো।

তপাই অমনি ছুটল। দাঁইহাট থেকে হাওড়া আর কতদূরের পথ। একবার শুধু মাটিতে পা দেওয়ার অপেক্ষা। পেটোর বিশ্বকর্মা ডিকে তো আছেই। তপাই গিয়ে ধরে আনল ডিকেকে। ডিকে এসে পেট ভরে সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে পেটো বাঁধা শেখাতে লাগল এদের। ডিকের জয় জয়কার পড়ে গেল এখানে।

বোমা তৈরী হলে প্রথম বোমাটি আনন্দ করে ফাটানো হ'ল কাটোয়ার এক সিনেমা হলে। দুজন লোক গুরুতর আহত হ'ল। একজন ঘটনাস্থলেই মরল। ওদের ভাষায় অবশ্য মায়ের ভোগে গেল। এরপর বোমা পড়ল একটি পুলিশ ভ্যানে। মৌচাকে ঢিল যাকে বলে। পুলিশ তো মারমুখি হয়ে উঠল। এলোপাথারি গুলি চালালো। কিন্তু সে গুলি লাগলে তো! অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ ওদের ধরতে না পেরে নানা কৌশলে ফাঁদ পাততে লাগল। কিন্তু না। বৃথা হ'ল। ওদেরও ফুর্তি তখন দেখে কে। কারণে অকারণে অযথাই চোর পুলিশের লুকোচুরি খেলার মতো যেখানে সেখানে প্যানিক সৃষ্টি করে পালিয়ে গিয়ে মজা দেখতে লাগল। পুলিশ ওদের ধরবার জন্যে চেষ্টা করে। কিন্তু গোলমাল বাধিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ে ওরা তার হদিশও পায় না।

তপাই মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। চীনা বাজার থেকে বোমা তৈরীর মাল মশলা কেনে। তারপর ডিকে এবং সম্ভব হলে আরো দু' একজন অভিজ্ঞ বোমা বিশারদকে সঙ্গে নিয়ে দাঁইহাটে ফেরে। ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে আবার ছেড়ে দেয় ওদের। তারপর আবার সুরু করে নিজেদের কাজ।

সেদিন পূর্ব পরিকল্পনা মতোই ডিকে এবং শান্ত দুই খ্যাতিমান

বোমাবিশারদকে নিয়ে পেটো বাঁধবার কাজে বসিয়ে দিল তপাই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি ভাঙা মন্দিরে চলতে লাগল কাজ।

আর তপাইরা তখন সশস্ত্র হয়ে এগিয়ে চলল ওদের আসল কাজ

www.arisumu.com

বনমালী করযোড়ে বলল—শোনো বাবারা।

করতে গ্রামের শেষ প্রান্তে বনমালি বণিকের বাড়ি। প্রচণ্ড ধনী লোক। বন্ধকী কারবারে এবং চড়া সুদে টাকা খাটিয়ে প্রচুর অর্থ

সঞ্চয় করেছেন। তপাইরা জনা দশেক ছেলে মিলে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির। রাত্রি তখন আটটা কি নটা। শীতের রাত।

দরজায় কড়া নাড়তেই বণিকের গলা শোনা গেল—কে!

—আমরা। দরজা খুলুন।

বণিককন্যা দরজা খুলেই অবাক। দেখল ভোজালি পাইপগান হাতে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে সব। ভয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল মেয়েটি।

তপাইরা ঘরে ঢুকল।

বনমালিও চিৎকার করে উঠল ওদের দেখে—কি চাই তোমাদের? একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছ কেন? তোমাদের হাতে ঐ সব মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র, ব্যাপার কি!

—ব্যাপার কিছুই নয় বনমালিবাবু। বহুৎদিন ধরে তুমি বহু গরীবের রক্ত শোষণ করেছ। আজ আমরা এসেছি তোমার রক্তপান করতে।

বনমালি বণিকের স্ত্রী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। এই কথা শুনেই ফিট হয়ে গেল সে।

বনমালি বলল—তার মানে?

—তুমি শয়তান। তুমি জোতদার। তুমি মহাজন। তুমি সুদে টাকা খাটিয়ে মানুষের রক্ত শোষণ করছ।

বনমালি করযোড়ে বলল—শোনো বাবারা। তোমাদের পায়ে পড়ি। আমার একটা কথা অন্তত শোনো তোমরা। আমি সুদের কারবার করি ঠিক। কিন্তু অনেকে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সুদ তো দূরের কথা আসলও দেয় না। তাছাড়া কোন গরীব দুঃখী লোক তাদের কারো ছেলে মেয়ের হঠাৎ বিয়ে বা মরণাপন্ন কোন রোগী চিকিৎসার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়ে যখন আমার পায়ের ওপর এসে পড়ে তখন যে আমি থাকতে পারি না। তখন সেই টাকার বিনিময়ে কিছু আমি নিই। তা বাবা এই গ্রামে তো অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি রয়েছে। সেই অসময়ে তারা যদি সুদ না

নিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করত ওদের, তাহলে তো ওরা এসে আমাকে বিরক্ত করত না। আমাকে সুদখোর তো এরাই করেছে বাবা। অথচ আমার এই টাকায় কত মেয়ের সুখের ঘর তৈরী হয়েছে, কত মানুষের সম্পত্তি রক্ষা হয়েছে। কত রোগী রোগমুক্ত হয়ে তার জীবন ফিরে পেয়েছে। আমি একজন সুদখোর এটাই তোমরা দেখলে। আমার অবদানটা তোমাদের নজর এড়িয়ে গেল? মানুষের বিপদে মানুষকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে আমি হলুম সুদখোর। আর যারা একটি পয়সাও সাহায্য না করে এক একটি অমূল্য জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল তারা হ'ল মানুষ!

তপাই চিৎকার করে বলল—চোপ্ হারামজাদা। আমাদের গণ আদালতের বিচারে তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি। সেই থেকে অনেক বড় বড় লেকচার শুনলুম তোমার। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তাহলে এখুনি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের হাতে তুলে দেবে। নাহলে মৃত্যুর জন্যে তৈরী হও।

বণিক বলল—তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই মুহূর্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি কোথায় পাব? এই বাজারে টাকা কেউ ঘরে রাখে? টাকা তো ব্যাঙ্কে।

—তোমাদের টাকা ব্যাঙ্কেও থাকে, ঘরেও থাকে। বার করো শিগ্‌গির।

—দোহাই বাবারা। তোমরা বিশ্বাস করো।

—আমরা কিছুই বিশ্বাস করব না। টাকা না পেলে এই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবো আমরা।

—তা তো দেবে। কিন্তু বাবা আমার তো পাপের পয়সা। গরীবকে শোষণ করা টাকা। এই টাকা তোমরা দেশপ্রেমিকরা কি করে নেবে বাবা? তোমাদের হাত কাঁপবে না?

—না। ও টাকা আমরা নেবো না। ও টাকা আমরা গরীবদের মধ্যেই বিলিয়ে দেবো।

—তোমরা মিথ্যে কথা বলছ। তা যদি হোত তাহলে এইভাবে

রাতের অন্ধকারে তোমরা এই কয়েকজনে আসতে না। দিনের আলোয় সমস্ত গরীব লোকদের নিয়েই আসতে। তা বেশ। আমাকে তোমরা প্রাণে মেরো না। কাল সকালে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। আমার যেখানে যা কিছু আছে সব আমি নিজে হাতে সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে চলে যাব এখান থেকে।

তপাই বলল—তুমি বহুৎ ধান্দাবাজ তা বুঝতেই পারছি। আমরা কাল সকালে ঐ সব করব আর সেই তালে তুমি আমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবে। ওটি হচ্ছে না। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তাহলে এখনো সময় আছে। টাকাগুলো বার করে দাও। তিন ঘণ্টা ভেবে দেখার সময় দিলুম। এর ভেতরে কি করবে ঠিক করো। আমরা একটু ঘুরে আসছি। কিন্তু সাবধান। বেশি চালাকি করতে যেও না। বাড়ি থেকে পালাতে গেলে বা পুলিশে খবর দিতে গেলেই বিপদে পড়বে। বাইরে আমাদের কড়া পাহারা এইটি শুধু মনে রেখো।

—তোমরা তিন ঘণ্টা সময়ই দাও আর সারারাতই দাও। আমাকে মেরে ফেললেও টাকা তোমরা পাচ্ছ না। কেননা ঘরে আমার কিৎসু নেই।

– বেশ। আছে কি না আছে পরে দেখা যাবে। আমরা ঘুরে আসছি। সময় কিন্তু তিন ঘণ্টা।

এই বলে তপাইরা চলে এলো বণিকের বাড়ি থেকে।

তারপর আবার সেই ভাঙা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পেটো বাঁধা তখন শেষ পর্য্যায়ে। ডিকে আর শান্ত তাড়াতাড়ি পেটো বাঁধার কাজ শেষ করে বলল—আমরা আজ রাতের ট্রেনেই পালাব ভাই। ট্রেন কটায় ?

—রাত বারোটায়।

—বারোটার ট্রেনেই যাব। দিনমানে নয়। কেননা রাতের ট্রেনে গেলে ভোরে হাওড়ায় নেমে গা ঢাকা দেবার সুবিধে হয়।

তপাই বলল—তা অবশ্য ঠিক।

এরপর সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে ওরা সকলে দল বেঁধে স্টেশনের দিকে চলল। যেতে যেতে ডিকে বলল—বণিকের ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকার কেসটা কি হল তপাই ?

—হবে। তবে ব্যাটা খুব পাঁয়তাড়া কষছে। তিন ঘণ্টা সময় দিয়েছি। না দিতে পারলেই ভোগে পাঠাব।

—যেভাবেই হোক টাকাটা আদায় করতেই হবে।

—সে কথা আবার বলতে ? ওটা পেলে আমাদের বম্বে যাওয়া আটকায় কে ?

—কিন্তু আমি কি করে খবর পাবো ?

—খবর পেঁছে যাবে ব্রাদার। খবর আমিই গিয়ে দিয়ে আসব।

—ঠিক আছে। তবে লক্ষ্য রাখিস টাকাটা এখানেই না হাপিস হয়ে যায়।

ওরা কথা বলতে বলতে জোর কদমে হেঁটে স্টেশনে এসে পেঁছুল। প্লাটফরমে উঠে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়াতে লাগল সব। তপাইয়ের দলে ওর ভগ্নিপতির খুড়তুতো ভাইও ছিল। ওর নাম জগা। জগা বলল—তপাইদা, আমরা যখন এতজন এখানে আছি আর সবাই যখন সশস্ত্র তখন একটা কাজ করলে হয় না ?

—কি কাজ বল ?

—এখন যে গাড়িটা এখানে আসবে সেটা হল ফারাক্কা প্যাসেঞ্জার ? এই গাড়িতে ভেণ্ডার কম্পার্টমেণ্টে ছানার ব্যাপারীরা কলকাতায় যায়। সেখানে একটু ঠেপ মেরে দেখলে হয় না ?

দলের সবাই লাফিয়ে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। এ তো মন্দ প্রস্তাব নয়। এখন আমাদের প্রচুর টাকার দরকার।

ডিকে বলল—যা করবি সাবধানে করবি। আমরা এতে অংশ নিতে পারছি না। কেননা আমাদের ফিরতেই হবে। নাহলে একটু হাত লাগাতাম।

তপাই বলল—কোন দরকার নেই। আমাদের ফুল ব্যাটেলিয়ান

এখানে রেডি। এমন প্যানিক সৃষ্টি করব এখানে যে কালকের কাগজের প্রথম পাতার খবর হবে এটা। ট্রেন' ডাকাতি আমার জীবনে এই প্রথম। কাজেই যা করব তা ইতিহাসে লিখে রাখার মতোই করব।

তপাইয়ের পিঠ চাপড়ে ডিকে বলল—সাব্বাস।

এমন সময় দূরে ট্রেনের আলো নজরে পড়ল। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল ওরা। আসছে—আসছে—ঐ তো আসছে ট্রেন। ফারাক্কা প্যাসেঞ্জার। এখানে স্টপেজ নেই। কিন্তু ইদানিং থামছে। প্লাট-ফরমে কোন যাত্রীও নেই। স্টেশন জনমানব শূন্য। প্রচণ্ড শীতের রাত। তায় দুর্দিনের বাজার। লোকজন এমনিতেই তো ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না। কাজেই বাধা দেবারও কেউ নেই। জয় গুরু। ট্রেনটা যেন আজও থামে।

ট্রেন এলো। থামল। ডিকে আর শান্ত উঠে পড়ল ট্রেনে।

তপাইদের ব্যাটেলিয়ানরাও এদিকে রেডি। একজন গার্ডের বুকে পাইপগান ঠেকাল, আর একজন ড্রাইভারের বুকে। বলল—খবরদার। আমরা নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ট্রেন ছাড়বে না।

অন্যান্যরা উঠল ভেন্ডারদের কামরায়। এই গাড়ির বিশেষত্ব হচ্ছে গাড়িতে আলো পাখা ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা নেই। এককালে হয়তো ছিল। কিন্তু সমাজবিরোধীদের দৌরাত্মে সেগুলো হাপিস হওয়ার পর থেকে আর লাগানো হয়নি। কাজেই ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। তপাইরা দলবদ্ধ হয়ে কামরায় ঢুকে বলল—কেউ চেঁচামেচি করবে না বা গোলমাল বাধানার চেষ্টা করবে না। যার কাছে মালকড়ি যা কিছু আছে দিয়ে দাও।

ব্যাপারীরা তো মালপত্তর নিয়ে কেউ ঢুলছিল কেউ ঘুমোচ্ছিল। এই না শুনেই পেটের পিলে মাথায় উঠে গেল তাদের। সভয়ে জোর হাত করে বলল—আপনারা দয়া করুন বাবারা, কোন মাল কড়িই আমাদের নেই। একেবারে কপর্দক শূন্য আমরা। কলকাতায় যাচ্ছি বিক্রী বাটা করে যখন ফিরব তখন আসবেন দেবো। এখন এই

ক্ষীর ছানা রসগোল্লা কাঁচা গোল্লা যা আছে যদি নেন তো কিছু নিন।

তপাইরা দেখল পদক্ষেপটা খুব ভুল হয়ে গেছে। সত্যিই তো। এখন তো ব্যাপারীদের কাছে টাকা পয়সা থাকবার কথা নয়। তবু বলল—সে তো বুঝলুম। এখন তাহলে কি দেবে দাও।

—ক্ষীর নিয়ে যান। ছানা তো খেতে পারবেন না। ক্ষীর খান। এই বলে একজন ক্ষীরের হাঁড়ি ধরিয়ে দিল হাতে।

জগা বলল—এক হাঁড়িতে কি হবে। আরো দু'হাঁড়ি দাও।

লোকটি এবার হাতে পায়ে ধরল ওদের—মরে যাব বাবারা। গরীব মানুষ আমরা। এই বেচে খাই। এই নিয়েই সন্তুষ্ট হও মহাপ্রভুরা।

জগা বলল—কোন কথা শুনতে চাই না। আর দুটো হাঁড়ি দিবি কিনা বল। নাহলে এই যে দেখছিস ভোজালি, একেবারে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেবো।

জগার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গুলির শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কোলাহল আর মার মার রব।

তপাইরা লাফিয়ে প্লাটফরমে নেমেই দেখল সর্বনাশ। চারিদিকে থুক থুক করছে সি, আর, পি।

চ্যাংড়ার মরণ সব। ফারাক্কা প্যাসেঞ্জারে এসেছে ডাকাতি করতে। এই গাড়ি যে ফারাক্কা থেকে সি, আর, পি আর মিলি-টারীতে বোঝাই হয়ে প্রতিদিন হাওড়ায় আসে তা ওরা জানতো না। জানলেও হয়তো সেই কুক্ষণে মনে আসেনি কারো।

ওরা যখন ভেন্ডার কম্পার্টমেণ্টে চড়াও হয়ে হম্বি তম্বি করছিল সেই সময় ব্যাপারীদের একজন চুপি চুপি উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নেমে সি, আর পি দের খবর দেয়। ফলং সংকট চরমতমং।

সি, আর, পি দের টর্চের আলোয় আলোকিত চারিদিক। সেই সঙ্গে ধর পাকড় আর প্রচণ্ড মার। দলের আট দশটি ছেলে তখন গুলিতে প্রাণ হারিয়ে পড়ে আছে প্লাটফরমে। ভোজালি পাইপ

গান ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ।

ডিকে আর শান্ত বাড়ি যাবে বলে এসেছিল! কাজেই ট্রেন আসার পর গাড়িতে উঠে যাত্রীদের দলে মিশে যাওয়ায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল তারা। বাদ বাকিরা কেউ ধরা পড়ল। কেউ মরল। যে গুলো ধরা পড়ল সে গুলোকে সি, আর পি-রা বন্দুকের বাঁট দিয়ে এমন মার মারল যে হাড় গোড় গুঁড়িয়ে দিল তাদের।

তপাই আর জগা ট্রেন থেকে নামা মাত্রই ক্ষুধিত নেকড়ের মতো হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো সি, আর, পি-রা। জগা ছিল সামনে। মারল বন্দুকের বাঁটের বাড়ি এক ঘা। এক অদৃশ্য শক্তি এবারেও রক্ষা করল তপাইকে। অন্য এক সি, আর, পি, এসে ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দিল তপাইয়ের গালে। তারপর ওর চুলের মুঠি ধরে লাথি মারতে মারতে টেনে নিয়ে এলো ওদের কম্পার্টমেণ্টে। এরপর এক এক করে পাঁচ ছ'জনকে। প্রত্যেকের অবস্থাই সঙ্গীন। ওদিকে জগাকে প্লাটফরমের ওপর ফেলে তার ওপর উন্মত্ত উল্লাসে লাফাতে লাগল সি, আর, পি-রা। তারপর ওর সংজ্ঞাহীন দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে কম্পার্টমেণ্টের গাদায় ফেলল। শুধু কয়েকটি তাজা লাশ পড়ে রইল প্লাটফরমের ওপর। চারিদিক রক্তে ভেসে যেতে লাগল।

অন্ধকার কম্পার্টমেণ্টে সি, আর, পি-রা আবার এসে নিশ্চিন্ত মনে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। অর্ধমৃত ছেলেগুলো গাদা করা রইল একপাশে। তপাইও অচৈতন্য হওয়ার ভান করে পড়ে ছিল তাদের পাশে।

একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল। তারপর শ্লথ গতিতে চলতে চলতে একটা স্টেশন পার হবার পর মাঠের মধ্যে এক জায়গায় সিগন্যাল না পেয়ে থেমে যেতেই একটা মওকা পাওয়া গেল! তপাই দেখল সি, আর, পি-দের মধ্যে তখন কারো নাক ডাকছে। কেউ ঢুলছে। ওর পাশেই যে বসেছিল ওর বুকে বন্দুক রেখে, তার রীতিমতো নাক ডাকছে তখন। তপাই আস্তে আস্তে বন্দুকটা সরিয়ে সোজা

হয়ে বসল। ভাগ্যে কম্পার্টমেণ্টে আলো নেই। কিন্তু মুশকিল হল পালাবে কোনখান দিয়ে? দরজাটা লক করা। সেখানে যেতে গেলে এলো মেলো ভাবে শুয়ে থাকা সি, আর, পি-দের কারো না

www.arisumu.com

তপাই দেরী না করে সেই চলন্ত ট্রেন থেকেই লাফিয়ে পড়ল বাইরে।

কারো পা লেগে যাবার খুবই সম্ভাবনা। আবার জানলা দিয়ে পালাতে গেলেও ধরা পড়ার ভয়। কেননা শীতের জন্য সব জানলার

সার্শি নামানো। তবুও ও জীবনের ঝুঁকি নিয়েই আস্তে আস্তে একটা জানলার সার্শি টেনে তুলল। ট্রেন তখন আবার চলতে সুরু করেছে। তবে গতি খুব কম। এরাও ঘুমে অঘোর। তপাই দেরি না করে সেই চলন্ত ট্রেন থেকেই লাফিয়ে পড়ল বাইরে। খোয়ায় পড়ে হাত পা কেটে ছিঁড়ে একশা হয়ে গেল। তবু সেই অবস্থাতেই পিছনদিকে ছুট-ছুট-ছুট।

এদিকে তপাই লাফিয়ে পড়ার পরই খোলা জানলার কনকনে ঠাণ্ডায় সি, আর, পি, দের ঘুম ছুটে যায়। তারপর টর্চের আলোয় যেই না দেখে একজন আসামী ভাগলবা তখনই হৈ হৈ রৈ রৈ। চেন তো নেই যে ট্রেন থামবে। তবু চেঁচামেচি করে আলোর সঙ্কেত দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে বহু কষ্টে অনেক দূরে যাবার পর ট্রেন থামাল। ট্রেন থামলে দলে দলে সব ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে টর্চের আলো ফেলে সে কি দারুণ তল্লাসী। বেগতিক বুঝে সেই কনকনে ঠাণ্ডাতেই পাশের জলায় নেমে পড়ল তপাই। তারপর গ্যাং কুলিদের পরিত্যক্ত একটা পোড়া দুর্গন্ধ হাঁড়ি মাথায় দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করল। এইভাবে অনেকক্ষণ থাকার পর যখন একটু নিরাপদ মনে করল, তখনই উঠে এলো জল থেকে।

ওদিক রাতের অন্ধকারে হুইশিল বাজিয়ে কালো ধোঁয়া ছেড়ে ফারাক্কা প্যাসেঞ্জার ছুটে চলল হাওড়ার দিকে। আর তপাইও শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলো দাঁইহাটে।

দাঁইহাটে ফিরে এলেও ও কিন্তু স্টেশনের দিকে গেল না। অন্ধকারে আত্মগোপন করে সোজা হাজির হ'ল ওর দিদির বাড়িতে। সেখানে তখন কান্নার রোল। কেননাঐ দুঃসংবাদ তখন দাঁইহাটময় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে জগার খবরটা তো এ বাড়িতে একটা অভিশাপের মতো। মা বাবার ঐ একটিই মাত্র ছেলে সে। সবাই তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তপাইদের দলের দুটি ছেলে যারা ড্রাইভার ও গার্ডকে আক্রমণ করেছিল, গোলমালের সুরুতেই তারা কোন রকমে পালিয়ে এসে বাড়ি বাড়ি খবর দেয়।

তপাই সেই আবছা অন্ধকারে ওর দিদির বাড়িতে আসতেই মীনা ছুটে এলো—হ্যাঁরে, তবে যে শুনলুম তোকেও ওরা ধরে নিয়ে গেছে!

—আমি কোন রকমে ওদের খপ্পর থেকে পালিয়ে এসেছি দিদি।

—জগা কই?

—সে বোধ হয় বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলেও তার অবস্থা খুবই খারাপ। বন্দুকের বাঁট দিয়ে ওকে এমন মেরেছে যে মাথার ঘি বেরিয়ে গেছে। সে যাক। তুই আমাকে তাড়াতাড়ি একটা জামা কাপড় দে। এগুলো ছেড়ে ফেলি।

তপাইকে ওর জামাইবাবুর একটা প্যাণ্ট আর শার্ট দেওয়া হল।

—একটা চাদর দিবিরে দিদি?

—এই নে। কিন্তু তুই এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যা তপাই। না তুই এ বাড়িতে আসবি না এদের এই সর্বনাশ হবে। এরা সবাই এখন তোকেই দোষারোপ করছে। সবাই বলছে বউমার ভাইয়ের জন্যেই ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল। এটা আমার শ্বশুরবাড়ি। এরপর আমি এখানে কোন মুখে ঘর করব বলত? তুই আমার এ সর্বনাশ কেন করলি তপাই?

—দিদি!

—না। তুই আমাকে দিদি বলে ডাকিস না। আমি জানব আমার তিনটে ভাইয়ের একটা ভাই মরে গেছে। আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। তুই আর কখনো এ বাড়িতে আসিস না তপাই। তুই দূর হ। তুই দূর হ। তুর দূর হ।

তপাই কেঁদে বলল—তুই আমায় অমন করে যেতে বলিস নারে দিদি। আমি ভাবতেও পারিনি ঠিক এইরকম একটা অঘটন ঘটে যাবে বলে। আমি তোর পা ছুঁয়ে বলছি দিদি আর কখনো এ কাজ আমি করব না। এবার থেকে আমি ভালো হবো।

—তাতে আর কিছুই লাভ হবে না রে। এদের যা সর্বনাশ

হবার তা হয়ে গেছে। তুই এখুনি পালা। নাহলে এরাই তোকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে।

তপাই একটুও দেরী না করে জামা প্যাণ্ট বদলে একেবারে রাস্তায়। কিন্তু রাস্তায় নেমেই চমকে উঠল সে—একি! মা তুমি? তুমি এত ভোরে কি করে এলে?

—তার আগে বল কোথায় যাচ্ছিস তুই?

—তা জানি না মা। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো।

—তোর মামার মুখে খবর শুনে রাতের গাড়িতে এসেছি আমি। এই মাত্র ষ্টেশনে নেমেই শুনলাম দারুণ গোলমাল হয়ে গেছে এখানে। কাল রাতে নাকি প্রচণ্ড গোলাগুলি চলেছে। আমার গাড়ি যখন কালনায় তখন দাঁইহাট থেকে ধরা কয়েকটা আধমরা ট্রেন ডাকাতকে ডাউন ট্রেন থেকে আপ ট্রেনে তুলে দিল কাটোয়ায় পৌছে দেবার জন্য। এখানেও ষ্টেশনে লোক হৈ হৈ করছে। দু' একজনের মুখ থেকে তোর নামও শুনতে পেলাম।

—তুমি ঠিকই শুনেছ মা। আমিও ঐ দলে ছিলাম। আমি ধরা পড়েও বেঁচে গেছি। আমাকে এখুনি পালাতে হবে এখান থেকে! তবে দাঁইহাট দিয়ে নয়। গঙ্গা পার হয়ে কৃষ্ণনগর অথবা বেথুয়াডহরি দিয়ে পালাব আমি।

—কোথায় পালাবি তুই?

—তা জানি না। যে দিকে দু চোখ যায় সেদিকে চলে যাব। তুমিও এসো না মা। আমাকে এবারের মতো শেষ বিদায় দেবে। দিদির বাড়িতে একদম যেও না। আমার জন্যে খুব বিপদ হয়ে গেছে ওদের। জগাটা অ্যারেস্ট হয়েছে। বেঁচে আছে কি তারও ঠিক নেই। এখন তোমার ও বাড়িতে না যাওয়াই ভালো।

দিদি আর কাল বিলম্ব না করে তপাইকে নিয়ে গঙ্গা পার হলেন। তারপর মেটেরিতে গিয়ে নতুন দিনের নতুন সূর্য উঠলে তপাই সূর্যসাক্ষী রেখে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বলল—এই তোমার পা ছুঁয়ে প্রতীজ্ঞা করছি মা। এবার থেকে আমি সত্যিই ভালো

ছেলে হবো। তোমাকে আমি কৃষ্ণনগরে গিয়ে ট্রেনে উঠিয়ে দেবো। তারপর……।

—তারপর?—তারপর যেখানেই থাকি না কেন ভালো ছেলে হয়েই থাকব আমি। ঘরে ফেরার পথ তো আমার নেই। নতুন দেশে নতুন করে নতুন জীবন সুরু করতে যাব।

মাকে নিয়ে গঙ্গা পার হল তপাই।

তারপর বাসে চেপে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত গেল। সেখানে গিয়ে টিকিট কেটে মাকে ট্রেনে চাপিয়ে চোখের জলে বিদায় নিল সে।

মাও সজল চোখে ছেলেকে বিদায় দিলেন। এ ছেলে পেটে ধরলেও এর ওপর কোন অধিকার তো তাঁর নেই। আমাদের সমস্ত অধিকার আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জন দিয়েছি। হিংস্র-রাজনীতির শিকার হয়ে আমরা বিসর্জন দিয়েছি আমাদের মনুষ্যত্বকে। মা বিসর্জন দিয়েছে তার সন্তানের অধিকারকে। স্ত্রী বিসর্জন দিয়েছে তার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখার সম্ভাবনাকে। আর—। আর থাক। না বলাই ভালো।

তপাই সেই যে গেল আর তার খোঁজই পেলাম না কেউ। তার নিরুদ্দেশ যাত্রা অগস্ত যাত্রা হল।

www.arisumu.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

এরপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। বাংলার ভাগ্যাকাশ থেকে দুর্দিনের সূর্যদেব অস্ত গেছেন। স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিনও শেষ হয়ে গেছে কবে। তপাইয়ের খোঁজে আমিও দেশ দেশান্তর চষে বেরিয়েছি। কথায় আছে যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই। সেই ভাবেই খুঁজেছি ওকে। কিন্তু না। সেই নষ্ট নক্ষত্র কোথায় কোনখানে যে খসে পড়েছে তা টেরও পাইনি কেউ।

অথচ তপাইকে এখন খুবই দরকার।

খবরের কাগজে 'নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র' বিভাগে ওকে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে অনেক বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছি। তার কারণ ইতিমধ্যে আমার বড় ভাগ্না শংকর নেফ্রোইটিসে মারা গেছে। জামাইবাবুও মারা গেছেন কিছুদিন আগে। ছোট ভাগ্না স্বপন বিয়ে করেছে। দিদি কখনো আমার কাছে, কখনো বা দাঁইহাটে মীনার বাড়িতে থাকেন। স্বামী এবং দুই পুত্রের শোকে দিদিরও একটু মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। এই সময় তপাইকে ফিরে পাওয়ার প্রয়োজনটা যে আমাদের কাছে কতখানি তা আমরাই জানি। কিন্তু কোথায় তপাই? সেই চন্দ্র আছে, সূর্য আছে, আকাশ আছে, পৃথিবী আছে। নেই শুধু তপাই। সে শুধু থেকেও নেই। কোন খোঁজ খবরই নেই তার। তপাই বলেছিল, "যেখানেই থাকি না কেন ভালো ছেলে হয়েই থাকব।" সে কী সত্যিই ভালো ছেলে হয়ে আছে? তপাই বলেছিল, "ঘরে ফেরার পথ তো আমার নেই। তাই নতুন দেশে নতুন করে নতুন জীবন শুরু করতে যাবো।" সে কী নতুন দেশে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছে? সেই নতুন দেশ কোথায়? নতুন জীবন কী?

এই সব প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে নিয়তই তোলপাড় করে। কিন্তু না, তপাই যেন তার সমস্ত স্মৃতি সত্বা নিয়ে রহস্যের অন্ধকারে বরাবরের জন্যই হারিয়ে গেল।

এই ভাবেই দিন যায়।

তপাইয়ের আশা মন থেকে যখন মুছেই ফেলেছি তখন হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা পিওন এসে একটি রেজেস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিতে যে ঠিকানা ছিল সেটি আমার পুরাতন বাসার। তখন আমি মধ্য হাওড়াতেই একটি বারো ঘর এক উঠোনের বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। এখন রামরাজাতলা স্টেশনের কাছে নিজস্ব মাথা গোঁজার একটু ডেরা করে চলে এসেছি। তবে আমার একটু অন্য পরিচয় থাকার ফলে নতুন ঠিকানায় চিঠি আসতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। চিঠিটা এসেছে জামালপুর থেকে। শ্যামলাল প্রসাদ নামে আমার এক বিহারী বন্ধু তাঁর মেয়ের বিয়েতে সপরিবারে যাবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। ব্যস। পত্র পাঠ যাবার মনস্থির করে ফেললাম। শিয়ালদহ থেকে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে জামালপুর পর্যন্ত একটি বার্থ রিজার্ভ করে দিব্যি চেপে বসলাম তাতে। তবে বন্ধুর অনুরোধ মতো সপরিবারে নয়। একাই চললাম নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে যাচ্ছি। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেল। একটি কোমল স্পর্শ পায়ের ওপর অনুভব করলাম। আর সেই সঙ্গে শুনতে পেলাম, "শুনিয়ে।"

চমকে উঠে বসলাম। দেখলাম অল্পবয়সী একটি মেয়ে কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার পায়ের কাছে। মেয়েটিকে দেখে খুবই দীন বলে মনে হল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা গায়ের রঙ। কিন্তু কী সুন্দর তার চোখ দুটো। বয়স কোন মতেই পনেরো ষোলোর উর্ধে নয়। দেখে মায়া হল খুব। বললাম—কী চাই?

—আপনার ঐ জলের জায়গাটা থেকে একটু জল দেবেন? বাচ্চাটাকে খাওয়াবো। এর খুব তিয়াস লেগেছে। গলাটা

শুকিয়ে গেছে একেবারে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে জলের জায়গাটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে।

মেয়েটি জলের জায়গার ছিপি খুলে শিশুটির মুখের কাছে ধরল। কী সুন্দর শিশু। টুক টুক করছে গায়ের রঙ। ফোলা ফোলা গাল। বছর দু'য়েকের হবে হয়তো। একটু অপরিছন্ন। শিশুটি জল দেখে মুখটা একবার চকিয়ে নিয়ে চুক চুক করে জল পান করতে লাগল। একদমে অনেকটা জল খেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বেচারি।

জল খাওয়া হলে জলের জায়গাটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে চলে গেল মেয়েটি। তারপর গেটের কাছে টয়লেটের গা ঘেঁষে বসে পড়ল চুপ চাপ। জলটা এঁটো হয়ে গেছে। তার ওপর শিশুটির লালা লেগে আছে বটলের মুখে! তাই এ জল আমি খাবো না। তবু ঘৃণা হল না। বরং আমার সযত্নে রাখা এই জলটুকু একটি শিশুর তৃষ্ণা নিবারণ করল দেখে মনের মধ্যে এক অপার আনন্দ পেলাম।

আবার শুয়ে চোখ বুজেছি। ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমিয়েও পড়েছি আবার। ফের সেই কোমল করস্পর্শ।

এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললাম—আবার কী?

—আর একটু জল দেবেন আমাকে?

আমার পাশের বার্থের একজন ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন—যা ভাগ এখান থেকে। যত্তো সব ভিখিরির বাচ্ছা বিনা টিকিটে গাড়িতে উঠবে তাও আবার বেছে বেছে থ্রি-টায়ারে। অন্য বগিতে যেতে পারিস না?

মেয়েটি করুণ কণ্ঠে বলল—গিয়া থা। লেকিন চড়নে নেহি সকা। খুব ভীড় আছে কিনা গাড়িতে।

—সেইজন্যে একেবারে থ্রি-টায়ারে ঢুকে পড়েছিস? মজা মন্দ নয়। তার ওপর সাহসও তো কম নয় দেখছি। রাত দুপুরে

লোকের ঘুম ভাঙিয়ে জল চাইছিস?

মেয়েটি বলল—মাফ করবেন। বাচ্ছার বাবার খুব জ্বর। তাই জল চাইছি একটু।

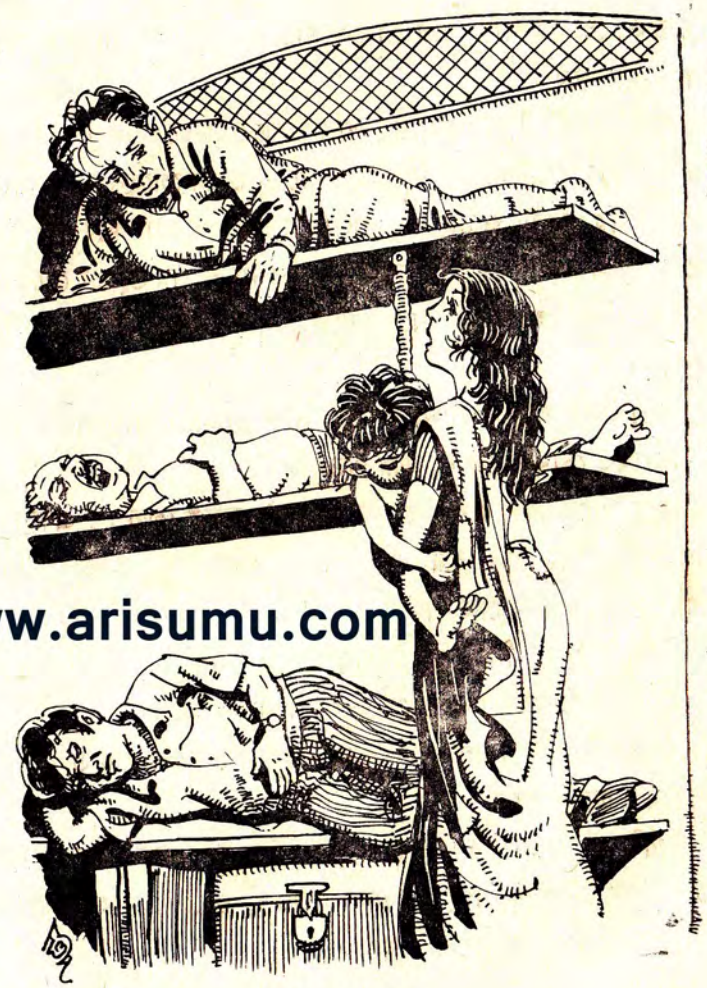

আর একটু জল দেবেন আমাকে?

www.arisumu.com

আমি ওয়াটার বটল্‌টা ওর হাতে দিয়ে বললাম—ঠিক আছে। এটা নিয়ে যা তুই। যেটুকু জল আছে খাইয়ে দে। আর এটা

তোর কাছে রেখে দে। আমাকে ফেরৎ দিতে হবে না।

মেয়েটির চোখ দুটো কৃতজ্ঞতায় চক-চকিয়ে উঠল যেন। পলিথিনের জলের জায়গাটা নিয়ে চলে গেল সে।

লোকটি গজ গজ করতে লাগল—রেলের কণ্ডাকটার গার্ড-গুলোও যে কোথায় যায় তা কে জানে। এগুলো গাড়ির ভেতর ঢোকে কি করে?

আর একজন ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরতে ফিরতে বলল—হাওড়া থেকে যিনি উঠেছিলেন তিনি বর্ধমানেই নেমে গেছেন। তারপর থেকে আর কেউ ওঠেনি। দরজাগুলোও ভালো করে লক করে দিলে এইসব আপদগুলো ঢুকতে পারত না। কিন্তু তা দেবে না কেউ। এখন আর খচ খচ করলে কী হবে? চুপ চাপ শুয়ে থাকুন।

ভদ্রলোকও আর কথা না বাড়িয়ে নাক ডাকাতে লাগলেন।

আমিও চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝ রাতে শিশুর কান্নার শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। একটানা প্রাণান্তকর সেই চিৎকারে কান পাতা দায়। দু'একজন যাত্রী বিরক্ত হয়ে শুয়ে শুয়েই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল।

সেই শিশু। কিশোরী মাতার বুকের নিধি।

মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—ও-না না-ন্-না।

কিন্তু শিশুর কান্না থামবার নয়। আসলে প্রচণ্ড ক্ষুধায় চিৎকার করছে বেচারি।

যাত্রীদের বিরক্তিকর মন্তব্য শুনে শিশুর পিতা এবার ধমকে উঠল শিশুটিকে—চোপ্। এক আছাড় মেরে মেরে ফেলব। গলা টিপে শেষ করে দেবো এখুনি।

একজন অবাঙালি ভদ্রলোক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় ভয়ানক রেগে বললেন—আরে ভাই, বাচ্চা সামালো। নেহী তো চেন পুলিং করকে উতার দেগা।

কিন্তু ততক্ষণে আমার মাথার ব্রহ্মতালুতেও শিহরণ লেগে

গেছে। আমি আপার বার্থে শুয়েছিলাম। এক লাফে নেমে পড়লাম নীচে। তারপর ছুটে গেলাম শিশুটির পিতার কাছে। এই কণ্ঠস্বর কার? এ যে আমার বহু পরিচিত গলার স্বর। এতো ভুল হবার নয়। গিয়ে দেখলাম ময়লা একটা চাদর আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে মেঝের ধুলোয় শুয়ে আছে কে যেন। কে-ও? আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম—এ কৌন শো রহা হ্যায়? কে শুয়ে আছে এখানে?

—আমার স্বামী।

—কী হয়েছে ওর?

—বহুৎ বেমার। খুব জ্বর হয়েছে।

এতক্ষণে শিশুর পিতার হুঁশ এলো যেন। মুখের ঢাকা সরিয়ে বলল—কে রে কাজল?

আমি ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললাম—আমি।

—মামা!

—আমাকে চিনতে পারছিস?

—আপনাকে চিনব না?

—একি দশা হয়েছে তোর? এই দেখব বলে কি এই গাড়িতে উঠেছিলাম আমি?

তপাই কোন রকমে উঠে বসে আমার পায়ের ধুলো নিল। ওর বউও হেঁট হয়ে প্রণাম করল আমাকে। শিশুটি কান্না ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমি তপাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ওর। ক্ষীণ চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কেমন যেন সর্বহারার ভাব। জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাবি?

তপাই বলল—সুলতানগঞ্জ। বাচ্চাটার মাথার চুল দিতে। খুব ভোগে ও। তাই মানসিক ছিল।

—এই রকম শরীরের অবস্থা নিয়ে এইভাবে না এলেই কি চলত না?

—আমি আর বাঁচতে চাই না মামা। বিশ্বাস করুন, একেবারে শেষ হয়ে গেছি।

—সেকি! তুই যদি এ কথা বলিস তাহলে তোর বউটার কি হবে? বাচ্চা মানুষ হবে কি করে?

—সব ঠিক হয়ে যাবে মামা। কারো জন্যে কারো আটকায় না।

—তুই আসছিস কোথা থেকে?

—আমি বারহারোয়া থেকে আসছি।

বউটি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল—ওর মুখে আপনার নাম অনেক শুনেছি মামাবাবু। আপনি সাচ্চা আদমি আছেন। আপনি ওর দেবতা।

—আমি সাচ্চা কি-ঝুটা সে হিসাব পরে হবে। তবে ওর এই রকম হাল দেখব এ আমি আশা করিনি। সেইসঙ্গে তোমাদের।

এতক্ষণে তপাই ঘরের কথা জিজ্ঞেস করল—ওরা সব ঠিক আছে তো?

বললাম—ওদের কথা জেনে কি করবি? দুঃখ পাবি। সংসারের চেহারাটাই এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। জামাইবাবু নেই, শঙ্কর নেই।

প্রায় চমকে উঠে কাঁদো কাঁদো স্বরে তপাই বলল—বড়দা নেই?

—না।

—কী হয়েছিল বড়দার?

—নেফ্রাইটিস।

—আর বাপির?

—তারও হাজার রকমের রোগ।

—মা তাহলে ····· ?

—মা ভালো আছে।

—আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?

—বিয়ে বাড়ি। তবে আর যাচ্ছি না। এখন আমি তোর সঙ্গে সুলতানগঞ্জেই যাবো। তারপর বাচ্চাটার মুণ্ডন হলে

তোদের সবাইকে নিয়ে যাবো ঘরে।

তপাই বলল—জীবন যুদ্ধে আমি হেরে গেছি মামা। তাই কোন মুখ নিয়ে যাবো সেখানে? তাছাড়া এখানেই তো আমার কাজ কর্ম। বাড়ি গেলে খাবোটা কী?

—এখানে তোর কিসের কাজ?

—আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারি করি।

—ওখানে গিয়েও তাই করবি।

তপাই হাসল। বলল—তার আগে ফলিডল খাবো। এ মুখ আমি কাউকে দেখাবো না।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে। কিন্তু এত জ্বর নিয়ে তুই আজই আসতে গেলি কেন?

—এলাম বলেই তো আপনার দেখা পেলাম। আসলে শরীর খারাপ নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। ট্রেনে ওঠার পর কাঁপ দিয়ে জ্বর এলো। কোন ওষুধ আছে আপনার কাছে?

আমি উঠে গিয়ে আমার ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা জ্বর কমাবার ওষুধ নিয়ে এলাম। সর্দি জ্বর পেটের অসুখ ইত্যাদির ওষুধগুলো বাইরে বেরোলেই সঙ্গে থাকে আমার।

ওষুধটা মুখে দিয়ে অবশিষ্ট জলটুকু খেয়ে নিল তপাই। আমি আর বার্থে গেলাম না। নীচে ওর পাশেই বসে রইলাম চুপ করে।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এলো।

সকালও হয়ে গেল একসময়। তপাই একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসল। ট্রেন থামল ভাগলপুরে।

ভাগলপুর বড় স্টেশন। ওখানে কলা বিস্কুট ইত্যাদি কিনে শিশুটিকে দিলাম। আমরা আমাদের জন্য চা নিলাম। ভাগলপুরের পর সুলতানগঞ্জ। তারপর জামালপুর। বিয়েবাড়ি মাথায় থাক। এখন এদের আগে সামলাই। আমি ওদের নিয়ে সুলতানগঞ্জেই নেমে পড়লাম।

সুলতানগঞ্জ ছোট্ট জায়গা। কিন্তু ভারি সুন্দর। এর আগে আমি এখানে আসিনি কখনো। এইখানে পুরাণের জহ্নু মুনির আশ্রম ছিল। ভগীরথ যখন গঙ্গা নিয়ে আসছিলেন তখন মুনির পাতার কুটীর জলের তোড়ে ভেসে যায় বলে জহ্নু মুনি এক গণ্ডুসে সব জলটুকু পান করে নেন। পরে ভগীরথের অনুরোধে এবং তাঁর কান্নাকাটিতে সন্তুষ্ট হয়ে মর্তভূমে গঙ্গাবতরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জানু চিরে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। এই সেই স্থান। এইখানে গঙ্গার গর্ভে শিবলিঙ্গাকৃতি একটি পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ে আছেন গৈবীনাথ। ইনি দেওঘরের বৈদ্যনাথের গুরুদেব। এইখান থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে দু'তিনদিনের পথ হেঁটে তীর্থ যাত্রীরা দলে দলে বৈদ্যনাথে যান।

যাই হোক, সুলতানগঞ্জে নেমে পায়ে হেঁটেই আমরা নিকটবর্তী একটি ধর্মশালায় গেলাম। অসময় বলে ধর্মশালায় যাত্রী ছিল না। তাই যাওয়া মাত্রই ঘর পেয়ে গেলাম। ধর্মশালাটার অসুবিধে এর ঘর মাত্র দুটি বাকিটা দালান। আর বাথরুমের কোন ব্যবস্থা নেই। সে যাই হোক, আমাদের প্রয়োজনে ঘর তো একটা পাওয়া গেল।

ওদের ঘরে বসিয়ে কাছাকাছি একটি দোকান থেকে কিছু সিঙাড়া কচুরি প্যাঁড়া ইত্যাদি নিয়ে এলাম।

তপাই বলল—মামা! আপনি আনলেন বটে কিন্তু বাচ্চাটার চুল দিতে এসে পুজো দেওয়ার আগেই খেয়ে নেবো?

ওকে বুঝিয়ে বললাম—তুই এখন অসুস্থ। এই অবস্থায় খালি পেটে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়বি। তাছাড়া মানত পুজোর সঙ্গে উপবাসের কোন সম্পর্ক নেই। নিঃসঙ্কোচে খা। খেয়ে আর একটা জ্বরের ওষুধ খেয়ে নে।

তপাইয়ের বউ ওর মুখের দিকে তাকাল।

বললাম—দেখছ কি! তুমিও খাও। কোন দোষ নেই এতে। তারপর চলো যে কাজের জন্য এসেছ।

আমরা সবাই জলযোগ সেরে বাইরে এলাম। এসে আর এক প্রস্থ চা খেয়ে চলে এলাম গঙ্গার তীরে। ধর্মশালাটাও গঙ্গার ধারে। শুধু সামান্য একটু ঢালু বেয়ে নামলেই বালি আর বালি। এই খানে বালির চরায় সারি সারি হোগলার ছাউনি দেওয়া দহি চুড়ার দোকান। খাট্টা দই, লাল লাল মোটা চিড়ে আর প্যাঁড়া। ছোট ছোট মেয়েরা দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে বসে আছে আর খদ্দের ডাকছে "আ যা বাবু, দহিচুড়া খা লো……।"

আর সেই বালুচরের প্রান্ত ঘেঁষে কাকের চোখের মতো জল। পতিতপাবনী মা গঙ্গা। গঙ্গার ঠিক মাঝখানে মোচাকৃতি একটি পাহাড়। যেন গঙ্গার গৌরীপট্টে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ বসানো আছে। আমরা একজন নরসুন্দরকে ডেকে শিশুর মুণ্ডন করালাম। তারপর গঙ্গায় স্নান করে নৌকোয় চাপলাম। মন্দির পাহাড়ের ওপর। পাহাড় নদীর মাঝখানে। ঠিক যেন একটি দ্বীপ। সেখানে যেতে গেলে নৌকো ছাড়া গতি নেই। গৈবীনাথ আছেন পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। আমরা ওপরে গিয়ে পাহাড়ে উঠলাম। তারপর মন্দিরে পুজো পাঠ সেরে আবার যখন নীচে এলাম তখন অনেক বেলা হয়েছে।

আমি বললাম—তপাই! এর আগে আমি গৈবীনাথের নাম শুনেছিলাম কিন্তু চোখে দেখিনি। আজ তোর ছেলের কল্যাণে গৈবীনাথও দেখা হল। সব চেয়ে বড় কথা এই ভাবে যে কখনো তোকে ফিরে পাবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ এই ধর্মশালাতে আমরা বিশ্রাম নিই। কাল সকালে বাড়ি ফেরবার ব্যবস্থা করব।

—কিন্তু মামা…।

—কোন কিন্তু না। তোর মায়ের মুখ চেয়ে তোকে অন্তত একটিবারের জন্যও বাড়ি ফিরতে হবে। তাছাড়া তুই বিয়ে করেছিস। এখন তোর একটা দায়ীত্ব আছে। ছেলেটাকেও মানুষ করতে হবে। তাছাড়া তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই কষ্টে আছিস। এই অবস্থায় ছেলেকে নিয়ে এই বিদেশ বিভুঁয়ে…

না না, এ হতে পারে না।

—কেন পারে না মামা? কষ্টে আছি তো কী হয়েছে? এখানে যারা আছে তারা কি মানুষ হয় না?

—তা হবে না কেন? তবু বাংলায় বাঙালির যে কালচার তার সঙ্গে তো মিলবে না।

তপাই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল এবার। তারপর বলল—বাঙালির কালচার? আমিও তো বাংলায় বাঙালির কালচারের মধ্যেই জন্মেছিলাম। কিন্তু আমার কী হল?

—কী হয়েছে তোর? মানুষের মাপ কাঠি দিয়ে বিচার করলে তোর মতো ছেলে হয়? তবে ভ্রান্ত রাজনীতি তোকে বিপথগামী করেছিল। এখন তুই আবার ফিরে এসেছিস। এখন ঘরের ছেলে ঘরে আয়।

—আমি গেলেও তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করবে? আমার সারাটা জীবনের পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে আমি কী করে সেখানে ফিরে যাবো? বড়দা কত কষ্ট পেয়ে মরে গেল, আমি তার পাশে থাকতে পারলাম না। বাপি আমাকে ভুল বুঝে চলে গেলেন, তাঁর কাছেও ক্ষমা চাইতে পারলাম না। তাছাড়া মায়ের ঐ অবস্থা আমি কী করে দেখব মামা!

—সব বুঝলাম। কিন্তু একেই বলে ভবিতব্য। তুই এই কবছরে একটা চিঠিও তো দিসনি। বিয়ে যে করলি সেটাও কি জানাতে পারলি না কাউকে? আমিও কি তোর কাছে পর হয়ে গেছি?

—আসলে আমার জীবনের সব কিছুই অন্যরকম। তাই এই বিয়েটাও একটা দুর্ঘটনার মধ্যে হয়ে গেল।

আমি হেসে বললাম—এইটাই ঘটনা।

এতক্ষণে তপাইয়ের বউ বলল—মামাবাবু! অনেক বেলা হয়েছে। এখন একটু আরাম করুন। পরে বিকেল বেলা বরং ঐসব আলোচনা করবেন।

তপাই বলল—হ্যাঁ ভালো কথা। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে?

আমি বললাম—স্টেশনের কাছেই একটা ভালো হোটেল দেখে এসেছি।

তপাইয়ের বউ বলল—আমি বলছিলাম কি, তা না করে নিজেরাই একটু ভাত ডাল রেঁধে নিলে হোত না? এদের এখানে সব কিছু ভাড়া পাওয়া যায়। আপনারা চট করে কিছু কিনে কেটে আনুন। আমি রেঁধে দিচ্ছি।

তপাই বলল—মামাকে যেতে হবে না। আমিই নিয়ে আসছি সব।

আমি পকেটে হাত দিতেই তপাই বলল—আমার কাছে আছে। আপনি বরং আপনার বউমার সঙ্গে একটু কথাটথা বলুন।

তপাইয়ের শিশু পুত্রটি তখন ধর্মশালার দালানে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে টলে টলে চলছে।

আমি বললাম—ছেলেটার নাম কি রেখেছ?

—বাবুয়া। ভালো নাম অজয়। আপনি তো আমার নাম জানতে চাইলেন না?

—তোমার নাম আমি আগেই জেনেছি। কাজল। ট্রেনের কামরায় তপাই তোমাকে ঐ নামেই ডেকেছিল।

কাজল হেসে বলল—আপনার কান খুব সজাগ তো। ওর মুখে আপনার কথা শুনে কত যে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল আপনাকে। ওর মা বাবার কোলে ছেলেটাকে তুলে দেবারও কত স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু সুখের ঘর তো আমার জন্যে নয়।

—কেন মা? আমার ভাগ্নাকে বিয়ে করে তুমি কি সুখী নও?

—তা নয়। তবে—।

—তবে কি?

—জীবনটাকে ও ইচ্ছে করে নষ্ট করছে মামা। নিজেকে

নিজেই ও নির্দয়ভাবে শাস্তি দিচ্ছে। আমি ওর সব কিছু মেনে নিতে পারি। কিন্তু আমিও তো মা। আমি তো নিশ্চয়ই চাইব আমার ছেলেটা মানুষ হোক। ভালো খেয়ে পরে বেঁচে বর্তে থাকুক। শুধু এইটাই ওকে আমি বোঝাতে পারি না।

—তোমার বাড়ি কোথায় ?

—কৃষ্ণনগর।

—বাড়িতে কে কে আছেন তোমার ?

—মা আছে, বাবা আছে, দাদা আছে। সবাই আছে আমার। কিন্তু তারাও যে কে কিভাবে আছে জানি না তাও।

—সেকি! বাড়ি যাওনা তুমি ? তাদের খোঁজ খবর রাখো না।

—ও খোঁজ-খবর রাখতে দেয় না। এমন কি যেতেও দেয় না আমাকে।

—কেন দেয় না মা ?

—জানি না।

—এ ভারি অন্যায়।

ততক্ষণে তপাই এসে পড়েছে।

কাজল চোখের ইশারায় এইসব কথা ওকে বলতে মানা করে দিল।

আমিও ওকে অভয় দিলাম।

এইটুকু সময়ের মধ্যে কত কী-ই না নিয়ে এসেছে ও। আসলে বাজার তো বেশি দূরে নয়। ধর্মশালার সামনেই পাওয়া যাচ্ছে সব কিছু। তাই দেরি হয়নি।

তপাই এসে সব গোছ গাছ করে দিয়ে নিজেই বসে গেল বউয়ের সঙ্গে রান্নার কাজে। চোখ মুখের ঘোর দেখে মনে হল জ্বরটা কমেছে অথবা ছেড়েছে। শরীরটাও একটু সুস্থ।

আমি ওর ছেলেটাকে নিয়ে ধর্মশালার বাইরে এলাম। এখন মাথা ন্যাড়া করিয়ে সাবান মাখিয়ে স্নান করানোর পর বেশ লাগছে

ছেলেটিকে। তার ওপর নতুন প্যান্ট শার্টও পরানো হয়েছে।

আমি ওকে কোলে নিয়ে নানা রকমের সাজানো গোছানো দোকান পত্তর দেখতে দেখতে এদিক সেদিক করতে লাগলাম। ছেলেটি আমার গলা জড়িয়ে গালে গাল ঠেকাল। হাসি খেল। ওকে আদর করে বুঝলাম ও খুব কোল ঘেঁসা ছেলে। একটুও কাঁদুনে নয়। মন আমার ভরে উঠল। সেই তপাই। দুর্বার দুরন্ত তপাই। এই সুন্দর ফুটফুটে শিশুটি তারই। একি ভাবা যায় ? আমরা বেঁচে থাকতে ব্যাটা কোথায় কার কোলে ঘুরছে আদর খাচ্ছে কে জানে ? আর ছাড়ছি না। সত্যি ! একে পেলে দিদি কত খুশিই না হবে। সব দুঃখ ভুলে যাবে বেচারি। পুনর্জন্ম পরজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তর যদি থাকে তাহলে শংকরও কি ঘুরে আসতে পারে না এর ভেতর দিয়ে ?

যাই হোক, ওকে নিয়ে অনেকক্ষণ এপথ সে পথ গঙ্গার ধার করে আবার ধর্মশালার দিকে ফিরে চললাম। কিন্তু ফিরলে কি হবে ? ব্যাটা এত দুষ্টু যে কিছুতেই ঘরে ফিরতে চায় না। একেবারে বাপ কা ব্যাটা। যত আমি ধর্মশালার দিকে মুখ করি ও ততই উল্টো দিকে মুখ করে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় চ-চ।

দুপুরের খাওয়াটা মন্দ হল না। ডাল ভাত আর আলু কপির তরকারি। কাজলের রান্নার হাতও ভালো। খেয়ে দেয়ে সামান্য একটু বিশ্রাম নেবার পর তপাই বউকে বলল—তুই দরজায় খিল দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়ে থাক। আমি এমটু মামুকে নিয়ে গঙ্গার ধারে যাই। যদি আমাদের ফিরতে দেরি হয়। তাহলে তুইও চলে যাস ঘাটে। কেমন ?

কাজল ঘাড় নাড়ল।

আমরা দুজনে পায়ে পায়ে বালিয়াড়িতে নেমে এলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যে কী মনোরম তা যে না দেখেছে সে ধারণা করতে পারবে না। আমরা একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে

বসে আমাদের অন্তরের কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

তপাই এক এক করে বলে চলল ওর জীবনের ইতিহাস।

ও বলতে লাগল। আর আমি শুনতে লাগলাম। সে এক আশ্চর্য কাহিনী। শুনতে শুনতে এমনই তন্ময় হয়ে গেলাম যেন আবার সেই অতীতের দিন গুলোতে ফিরে গেলাম আমি। আমার চোখের সামনে ছায়াছবির দৃশ্যের মতো সব কিছু যেন ফুটে উঠতে লাগল।

মাকে কৃষ্ণনগরে ট্রেনে উঠিয়ে দেবার পর তপাই কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। ক্লান্তিতে সারা শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। গভীর ঘুমে দু'চোখ বুজে আসছে ওর। প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেটের ভেতর চন চন করছে। পকেট হাতড়ে দেখল গোটা পাঁচেক টাকা সামান্য কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর ওর কিছুই নেই।

তার ওপর কৃষ্ণনগর জায়গা হিসেবেও খারাপ। ওর বয়সী কোন ছেলের পক্ষে এখানে লুকিয়ে থাকাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। এই মুহূর্তে ওর কী যে করণীয় তা ও ভেবে পেল না।

যাই হোক, তপাই ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় একটি ছোট্ট চায়ের দোকানে এসে বসল।

দোকানদার ওর মুখের দিকে এক নজর তাকিয়েই বলল—কী ভাই, কোথাও কোন খুন খারাপি করে এসেছ নাকি? মুখ একেবারে তুলসী পাতা যে?

তপাই বলল—না না, সে সব কিছু নয়। এক কাপ চা আর একটা পাঁউরুটি দাও দেখি।

—বুঝে গেছি। চা পাঁউরুটি অবশ্যই দেবো। দামও নেবো না। কিন্তু খাওয়া হলেই কেটে পড়বে। নাহলে বিপদে পড়ে যাবে কিন্তু। এই এলাকায় তোমাকে নতুন দেখছি। আসলে এখানে চারিদিকেই আই, বি, র লোকেরা ঘোরাফেরা করছে। বিশেষ করে চায়ের দোকানগুলোর উপরেই ওদের নজর বেশি।

কাজেই—

তপাই বলল—তুমি মুখ দেখে মনের কথা বেশ ভালো বুঝতে পারো দেখছি।

দোকানদার বলল—দিনরাত দেখছি ভাই। দেখে দেখে চোখ পেকে গেছে। তা যাক। বাড়ি-কোথায় তোমার?

তপাই মিথ্যে করে বলল—বর্ধমান।

দোকানদার চা আর পাঁউরুটি দিতে দিতে বলল—বেশ তো কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারা। তা মরতে এ লাইনে কেন এলে?

তপাই হেসে বলল—তাও কি বলে দিতে হবে? আমি একা নই। আমার মতো অনেকেই এসেছে। হাজারে হাজারে।

—কিন্তু তোমরা কি বুঝতে পারছ না, যে সর্বনাশা খেলায় তোমরা মেতেছ সে খেলার পরিণামটা কী?

—বুঝতে পেরেছি বলেই তো আর এই খেলা খেলতে চাইছি না দাদা। কিন্তু এখন আমি এমন এক জালে জড়িয়ে পড়েছি যে ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে বসে থাকলেও আর আমার বাঁচার কোন পথ নেই।

দোকানদার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—শোনো তাহলে বলি। যদি তুমি সত্যিই বাঁচতে চাও, ভালো হতে চাও, আমি তোমাকে একটা উপায় বলে দিতে পারি।

তপাই দোকানদারের মুখের দিকে তাকাল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চাপ দাড়িওয়ালা এক যুবক ছুটতে ছুটতে এসে বলল—সর্বনাশ হয়ে গেছে বাঁকাদা। সুব্রত সাধুখাঁর আড়তে হানা দিতে গিয়ে কুশলদা দল বল সমেত ধরা পড়ে গেছে।

—সেকি!

—হ্যাঁ। তোমার দোকানে যেগুলো রাখা আছে সেগুলো আমাকে দিয়ে দাও। আমি অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলি। নাহলে হয়তো এখুনি পুলিশ এসে তল্লাসী চালাবে।

দোকানদার বাঁকাদা বলল—সেই ভালো। তুই ওগুলো নিয়েই

যা ভাই। ঐ ওদিকে পলিথিন চাপা আছে। এসব আর এখানে রাখিস না। এমন কিছু করিস না যাতে আমি জড়িয়ে পড়ি।

ছেলেটি ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে যন্তরগুলো নিয়ে এলো। তারপর বলল—আচ্ছা বাঁকাদা! ওরা কী করে টের পেল বলতো?

—কে জানে ভাই। তবে এমনও হতে পারে দিনকাল খারাপ পড়েছে, সেইজন্যে ওরা হয়তো আচমকা কোন আক্রমণ প্রত্যাশা করে আগে থেকেই তৈরী ছিল।

—হয়তো তাই। তবে কিনা আলোচনাটা আমাদের গোপনে হয়েছিল।

—তোদের ভেতর থেকেই কেউ অসাবধানে কারো কাছে লিক করে ফেলেনি তো?

—কার কাছে করবে? কাল দুপুরে তোমার দোকানে বসে লুটের পরিকল্পনা হল। তারপর এইটুকু সময়ের মধ্যে কী করে টের পেল ওরা?

—ভগবান জানে।

—ভগবান জানে কিনা জানিনা। তবে তুমি কিন্তু জান।

বাঁকাদা চমকে উঠে বলল—তার মানে?

—কাল রাত দশটার সময় সাধুখাঁর ওখানে তুমি কী করতে গিয়েছিলে? ঐ সময় তো ওখানে তোমার যাবার কথা নয়।

বাঁকাদা বলল—তোরা কি আমাকে সন্দেহ করছিস?

—হ্যাঁ। এবং এখন মনে হচ্ছে গোপনে পুলিশকেও তুমি সমস্ত খবরাখবর পৌঁছে দাও।

—তোরা আমাকে ভুল বুঝিস না বিশে। কাল রাতে আমি সাধুখাঁর বাড়ি কেন গিয়েছিলাম তা তোরা বুঝবি না। আমি ইনফরমার নই।

যুবক ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—এক গলা গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে একথা বললেও তোমাকে আর আমরা বিশ্বাস করব না। আমাদের গোপন আদালতের রায় বেরিয়ে গেছে। আমি তারই পরোয়ানা নিয়ে

এসেছি।

বাঁকাদা শিউরে উঠল। আসন্ন মৃত্যুভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল

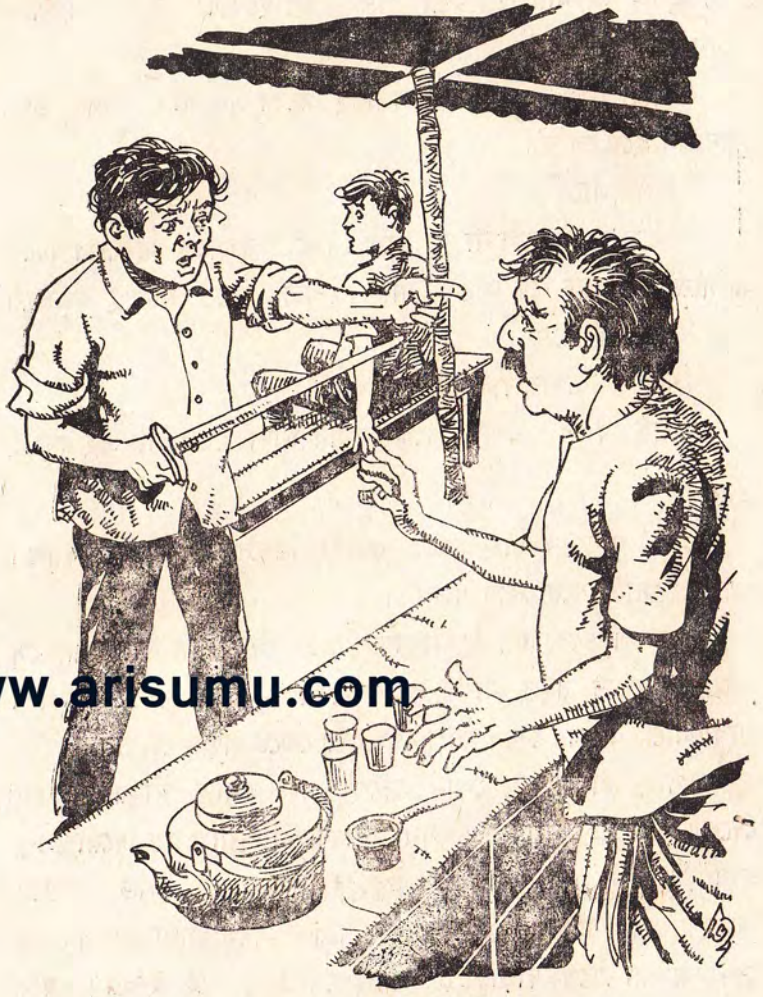

www.arisumu.com

আমি তারই পরোয়ানা নিয়ে এসেছি।

ওর মুখ। তাই কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—বিশে! মানুষ চিনতে শেখ। এমন ভুল করিস না বিশে।

কিন্তু ততক্ষণে সেই যন্তরগুলোর ভেতর থেকে বিশে একটা

কিছু বের করে সজোরে আঘাত করেছে বাঁকাদাকে। বাঁকাদা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। রক্তে ভেসে গেল দোকানঘর।

যুবক একবার তাকিয়ে দেখল তপাইকে। তারপর বলল—তুমি কে?

তপাই বলল—আমিও তোমারই মতো একজন। কিন্তু এখন অন্যজন হয়ে গেছি।

—তার মানে?

—বুঝতে পারলে না? বলে হাসতে হাসতে যুবকের দিকে এগিয়ে তার হাত থেকে সেই মারণ অস্ত্রটা কেড়ে নিয়েই ঢুকিয়ে দিল ওর পেটের ভেতর।

যুবকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

তপাই বলল—এখন থেকে আমার আদালতের রায় এই রকমই হবে।

তপাই যুবকের কাছ থেকে একটি রিভলভার উদ্ধার করল। তারপর সেটি নিয়ে নেমে এলো পথে।

দূরে দাঁড়িয়ে এই হত্যাকাণ্ড যারা দেখেছিল তারা আর সে তাল্লাটে কেউ রইল না। আশপাশের দোকানগুলোও প্রকাশ্য দিবালোকে এইসব দেখে ঝাঁপ বন্ধ করে কেটে পড়ল যে যার।

তপাই ভাবল, এ কোন দেশে বাস করছি আমরা? এই দেশের মানুষই নাকি একদিন স্বাধীনতার নামে রক্ত দিয়েছিল? হায় স্বাধীনতা। মুক্তির মন্দিরের সোপানে দাঁড় করিয়ে কাপুরুষত্বের এই শিকল তুমি কেন পরিয়ে দিলে আমাদের পায়ে? কেন আমরা রুখে দাঁড়াতেও ভুলে গেলাম? হে ঈশ্বর! যদি তুমি সত্যিই থাকো, তাহলে তোমার কাছে আমার একটিই অনুরোধ —যেন এইরকম অধঃপতন কোন জাতির কখনো না হয়।

তপাই যখন উদাসভাবে পথ চলছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে একটা সাইকেল ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল। সাইকেলে যে ছিল সে বলল—এইভাবে পথ চলে বন্ধু? তোমার সারা গায়ে রক্তের

দাগ। তুমি তো নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দিচ্ছ। চারিদিকে পুলিশ দৌড়াচ্ছে। এখুনি ধরা পড়বে তুমি।

—পড়লেই বা।

—হাসালে ভাই। এসো, উঠে পড়ো আমার সাইকেলে।

তপাই ওর সাইকেলে চেপে বসল। সাইকেল ওকে নিয়ে গেল এক গভীর জঙ্গলে।

যে ওকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে এলো সে ওরই বয়সী এক যুবক। বলল—আমি দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। ঐ বাঁকাদার মতো লোক হয় না। আর ঐ যে ছেলেটিকে তুমি মারলে ঐ ছেলেটি ইংলিশে অনার্স। প্রথমে বেশ ভালোই রাজনীতি করছিল। এখন লুট আর খুনের নেশায় মেতে উঠেছে। মেয়েদের ওপরও চড়াও হচ্ছে আজকাল। ওর উপযুক্ত শাস্তিই তুমি দিয়েছ ওকে।

—কিন্তু তুমি কে?

—আমি তোমার বন্ধু। আমার দাদাকে ওদের ঐ দলটা শুধু মাত্র সামান্য একটু কথা কাটাকাটির রাগে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। কাল দুপুরে বাঁকাদার দোকানে বসে ওরা যা আলোচনা করেছিল আমি তা আড়ি পেতে শুনেছি। আমিই সতর্ক করে দিয়েছিলাম সাধুখাঁদের। ওরা রাত্রিবেলা বাঁকাদাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল কথাটা সত্যি কিনা? বাঁকাদা প্রথমে অবশ্য স্বীকার করেনি। পরে চাপে পড়ে করেছিল। একেবারে নির্দোষ বেচারি। যাইহোক। ওদের পুরো গ্যাঙটা ধরা পড়েছে। বাকি ছিল ঐ শয়তানটা। ওরও পালাবার পথ ছিল না। পুলিশের গুলিতে মরত। মরল তোমার হাতে। তা যাক। যে প্রতিশোধ আমি বা আমরা নিতে পারছিলাম না সেটা আমাদের হয়ে তুমিই নিয়েছ। তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, তার আগে তুমি কে? তোমার নাম কি? এইসব পরিচয় দাও। আমি কিন্তু প্রথমে তোমাকে ওদেরই একজন ভেবেছিলাম। পরে হঠাৎ তুমি অন্য মূর্তি ধরতেই ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে উঠল আমার

কাছে।

তপাই এক এক করে ওর সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে ছেলেটি বলল—তোমার নাম তপাই। আমার নাম বুবাই। ভালোই হয়েছে। সব চেয়ে খুশি হয়েছি তোমার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে। এখন তুমি এক কাজ করো। আমাদের বাড়ি চলো। আমি তোমাকে আমার জামা প্যাণ্ট দেবো, সেগুলো পরে এগুলো কেচে ফেলো। স্নান খাওয়া সেরে দুপুরে বিশ্রাম নাও। তারপর রাত্রিবেলা ব্যবস্থা করব তোমার।

বুবাই ওকে সাইকেল চাপিয়েই অন্য পথে একটু ঘুরে নিয়ে এলো ওদের বাড়ি।

মধ্যবিত্ত পরিবার। ছোট্ট সংসার। চার কামরার নতুন একতলা একটি বাড়ির কাছে এসে বুবাই দরজার কড়া নাড়ল—কাজল।

ভেতর থেকে সাড়া এলো—যাচ্ছি।

—একটু তাড়াতাড়ি।

ওদেরই বয়সী স্কার্ট পরা একটি কিশোরী এসে দরজা খুলল। ঘন কালো গায়ের রঙ। কিন্তু কী অপূর্ব তার মুখশ্রী। তপাই দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

মেয়েটিও বিস্ময় ভরা চোখে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তারপর বলল—ও কে দাদা! ওর গায়ে রক্তের দাগ কেন?

বুবাই ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে বলল—চুপ। ওকে একটা লুঙ্গি আর জামা দে। আর চটপট কেচে দে ওর জামা প্যাণ্টগুলো।

—তুমি কি জানো দাদা, বাঁকাদা খুন হয়েছে। আর যে খুন করেছে তাকেও খুন করেছে আর একজন!

—জানি।

—আচ্ছা দাদা, বড়দাকে খুন করবার সময় ঐ খুনিটাও দলে ছিল, না?

—হ্যাঁ। শুধু ছিল না, ও নিজেও হাত লাগিয়েছিল।

—কিন্তু ওকে কে খুন করল বলতো? ওকে যে খুন করেছে পুলিশ নাকি খুব চেষ্টা করছে তাকে ধরবার। এরই মধ্যে চারিদিকে এমন জাল পেতেছে যে সে যাতে কৃষ্ণনগর থেকে বেরোতে না পারে। আমি তো খবরটা শোনার পর থেকেই ভগবানকে ডাকছি, হে ভগবান! ওকে যেন পুলিশে কখনো না ধরতে পারে।

বুবাই বলল—ঠিক বলছিস? তাহলে আমাদের দাদার হত্যাকারীকে যে খুন করেছে তাকে একটু বেশি রকম তোয়াজ কর। সে তোর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

খবর শোনা মাত্রই বুবাইয়ের মা-বাবাও এটে এলেন।

কাজল কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে তপাইয়ের হাত দুটো মুঠো করে ধরল। তারপর ওর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে সে কী কান্না।

বাবা বললেন—ছেলেটাকে যে নিয়ে এসেছিল কেউ দেখেনি তো?

বুবাই বলল—মনে হয় না। তবে খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখতে হবে ওকে।

—ওকে এখান থেকে পাচার করবি কি করে?

—এখন এসব কথা থাক। ওকে সরিয়ে দেওয়াটা খুব সহজ উপায়েই হয়ে যাবে। বেচারি আগে একটু স্নান খাওয়া করুক। বিশ্রাম নিক। ওকে একটু ঘুমোতে দিতে হবে। ওর সব কথা শুনেছি আমি। আমার জীবন দিয়েও ওকে আমি রক্ষা করব।

মা এসে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—দীর্ঘজীবি হও বাবা। আমার ছেলের হত্যাকারিকে তুমি যে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছো তাতে আমি আশীর্বাদের চেয়ে বড় উপহার তোমাকে আর কিছুই দিতে পারব না। ভগবানের কাছে কামনা করি কেউ যেন তোমার গায়ে একটি আঁচড়ও না কাটতে পারে।

তপাই বুঝতে পারল এইটাই হচ্ছে তার সত্যিকারের নিরাপদ আশ্রয়। সে ঝুঁকে পড়ে সেই মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম

করল।

কাজল ওকে বাথরুম দেখিয়ে দিল।

তপাই বাথরুমে গিয়ে বেশটি করে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে স্নান করে নিল। ওর জামা প্যাণ্ট নিজেই কাচতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা দিল কাজল। সে ওর দাদার লুঙ্গি আর হাওয়াই সার্ট এগিয়ে দিল একটা।

তপাইয়ের যেন পুনর্জন্ম হল। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে গরম গরম লুচি, আলুভাজা আর হালুয়া খেয়ে প্রথমেই ওর ক্ষুধার নিবৃত্তি করল। তারপর একটা আলাদা ঘরে মানে যে ঘরটা এ বাড়ির বড় ছেলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল। ঘরের দেয়ালে বড় ছেলের একটি ফোটো টাঙানো ছিল। ও একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। দরজায় টক টক শব্দ শুনে।

তপাই ঝেড়ে উঠে বসল। বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠল একবার। পরক্ষণেই মনে হল, ভয় কী! সে তো কোন শত্রু পুরীতে নেই। সে সুসজ্জিত গৃহকোণে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে।

দরজা খুলেই দেখল বুবাই দাঁড়িয়ে।

—কী! ঘুম হল?

—সে কথা আবার বলতে? কতদিন যে এমন শান্তিতে ঘুমোইনি।

—আমি আরো দু'বার ডেকেছিলাম। তুমি খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলে। কাজল একবার ডেকেছিল। তা বেলা যে অনেক হল বন্ধু। এবার দুটো ভাত মুখে দাও। ঘরের ভাত যে কতদিন পেটে পড়েনি তা বেশ বুঝতেই পারছি, এসো।

তপাই চোখে মুখে জল দিয়ে দালানে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় বসল। বুবাইও বসল ওর পাশে। বসে বলল—দেখো ভাই! কোন কোন মানুষ কোন কোন মানুষের মধ্যে তার এক পরমা-

ত্মীয়কে খুঁজে পায়। আমিও তোমার মধ্যে ঠিক তেমনি এক-জনকে পেয়েছি। তোমাকে আমি সহজে ছাড়ছি না। দু'চারদিন থাকো তুমি আমাদের বাড়িতে। তারপর তোমার অন্য ব্যবস্থা আমি করব। আর সেই হবে আমার বন্ধুত্বের প্রতিদান।

তপাই কোন কথা বলল না।

কাজল খেতে দিল ওদের।

মা এসে পাশে বসলেন।

বুবাই বলল—আমার এই যে বোনটিকে দেখছ। কত ছোট্ট বোনটি আমার। কিন্তু অত্যন্ত কাজের। তুমি কি ভাবতে পারো, এই সমস্ত রান্না ও নিজে করেছে।

তপাই একবার চেয়ে দেখল কাজলকে।

কাজল বিনয় মিশ্রিত নম্রতা মুখে এনে রান্না ঘরে চলে গেল।

সত্যি! কত কী-ই না করেছে। আলুভাজা, বেগুনভাজা, পালম শাকের ঘণ্ট, ফুলকপির তরকারী, মাছের ঝাল, টমেটোর চাটনি। পেট ভরে তৃপ্তি করে খেল তপাই।

বুবাই বলল—ও পড়াশোনাতেও খুব ভালো। ক্লাস এইট-এ পড়ছে। ফার্স্ট সেকেণ্ড না হলেও স্কুলে ভালো রেজাল্ট করে ও। আর রান্না তো মুখে দিয়েই দেখলে। ভগবান ওকে সব দিয়েছেন। যেমনি গুণ, তেমনি সুন্দর মুখশ্রী। শুধু গায়ের রঙটাকেই যা কালো করে পাঠিয়েছেন। তবে ভাই আমার এই আদরের বোনটি যার হাতেই পড়ুক না কেন, তার সুখের ঘর আলো করে দেবে।

মা বললেন—তোমার কোন দাদা টাদা নেই?

—আছে। আমার চেয়ে দু'বছরের বড়।

—তোমার মতো সুন্দর? কী করে সে?

তপাই বলল—কী আর করবে। একটা চা পাতার দোকানে সামান্য মাইনের কাজ করে। আসলে বসে না থেকে ব্যাগার খাটে।

—তোমরা তো ব্যানার্জী। আমরাও মুখার্জী। তাই

ভাবছিলাম যদি তোমার দাদার সঙ্গে মেয়েটার ব্যাপারে একটু কথা-বার্তা বলা যেত।

তপাই হেসে বলল—বললে আমার বাবার সঙ্গেই বলবেন। দাদা আর ও ব্যাপারে কী বলবে। তাছাড়া বিয়ে করে খাওয়াবে কি?

বুবাই বলল—মা! এখন এসব কথা থাক। আগে আমি বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে ওর একটা ব্যবস্থা করি। যেভাবেই হোক ওকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। নাহলে দুদিনে গৃহবন্দী থেকে হাঁফিয়ে উঠবে বেচারি।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে আবার দরজা জানলা বন্ধ করে তেড়ে একটা ঘুম। সন্ধে পর্যন্ত ঘুমোবার পর রাত্রে আলসে ঘেরা খোলা ছাদে শুয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল তপাই। কৃষ্ণনগরের কথা এর আগে অনেকের মুখে অনেকবার শুনেছে ও। কিন্তু সেই কৃষ্ণনগর যে এমন গাছ পালায় ভরা সুসজ্জিত নগরী তা ও জানত না! সবচেয়ে নিরাপদ হল এদের এই বাড়িটা। শহরের ঘন বসতি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। কাজেই এইখানে গাছপালার শোভাও একটু বেশি। তপাইয়ের মন ভরে গেল।

ও যখন বসে বসে নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ ওঠার দৃশ্য দেখছে তেমন সময় চা নিয়ে ওপরে এলো কাজল। বাংলার মাজা কালো শ্যামলাবরণ গায়ের রঙ। অপূর্ব মুখশ্রী। একটু বেঁটে-খাটো চেহারা। মাথা ভর্তি চুল। ক্লাস এইট-এ পড়ে। কী উচ্ছল। তপাইয়ের মনটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল ওকে দেখে। ও ভাবল আজ যদি ও বিপথগামী না হোত, ও যদি সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করত তাহলে নিশ্চয়ই ও অন্য কোন স্বপ্ন দেখত। কিন্তু ও যে নষ্ট হয়ে গেছে। ওর যে কোন নিরাপত্তা নেই। কিন্তু কেন এমন হল? ওদের পাড়ার কত মেয়েকে তো দেখেছে। নিজের মায়ের পেটের বোন ছাড়া তাদের কাউকে ওর অন্য কিছু বলে কখনোই মনে হয়নি। কিন্তু কাজলকে দেখে ওর অন্যরকম মনে হচ্ছে কেন? তবে কি তপাই আর ছোটটি নেই?

এখন কি ও ভেতরে ভেতরে অনেক বড় হয়ে গেছে?

কাজল এসে হাসি হাসি মুখ করে ওর সামনে বসে বলল—কী এত ভাবা হচ্ছে? দস্যি ছেলে! দাদার মুখে আমি আপনার কথা সব শুনেছি।

—তাহলে তো তুমি নিশ্চয়ই জেনে গেছ আমি কত খারাপ ছেলে।

—কিন্তু আপনিই তো বলেছেন এখন থেকে আপনি ভালো ছেলে হয়ে যাবেন।

—বলেছি। কিন্তু কেউ কি সে কথা বিশ্বাস করবে?

কাজল তপাইয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—আমি করব।

তপাইয়ের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। বলল—শুনেও সুখী হলাম। তারপর বলল, জানো কাজল, তোমাকে এর আগে কখনো তো দেখিনি, কিন্তু এখন এই একবার দেখেই মনে হচ্ছে তুমি আমার কত আপনজন।

কাঁপা কাঁপা গলায় কাজল বলল—আমারও।

—সত্যি!

কাজল তপাইয়ের হাতে হাত রেখে বলল—গা ছুঁয়ে বলছি।

—আমি যদি খুনি না হতাম, আমি যদি পলাতক না হতাম, যদি আমি ভালো ছেলে হতাম, তাহলে আর একটু বড় হয়ে আমি ঠিক বিয়ে করতে চাইতাম তোমাকে।

কাজল তপাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে করুণভাবে বলল—আপনাকে এমন সুন্দর দেখতে আর আমি একটা কালো মেয়ে।

—তোমার এই কালোর মধ্যেই যে আমি আলো দেখেছি কাজল।

কাজল হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালাল সেখান থেকে। আর তপাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ওর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে। ওর মনের মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ তোলপাড় করতে লাগল।

একি হল ওর! কখনো কোন অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে এইভাবে তো কথা বলেনি ও? যে নিয়তি ওর নিষ্ঠুর হাতে ছুরি তুলে দিয়েছে সেই নিয়তিই ওর সামনে কেন নিয়ে এলো এই কুসুমকলিকে? তপাই জেদি ছেলে। তাই মুহূর্তে মনকে শক্ত করে ফেলল। না, এইভাবে নিজেকে দুর্বল ও করবে না। আর এখানে থাকবে না ও। যাকে একবার দেখলেই ভালো লাগে তার কোন অনিষ্ট কখনোও করবে না। তাই কাজলের প্রতি মন আরো বেশি দুর্বল হবার আগেই এখান থেকে চলে যাবে। কারো কোন সাহায্যই ও নেবে না। রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি ও চলে যাবে এখান থেকে। ফাঁকা মাঠের বেড়াল ও। একবার মুক্ত পথে বেরিয়ে পড়লে আর ওকে পায় কে?

কাজল চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই বুবাই এলো। বলল—তোমার একটা ব্যবস্থা করে এলাম বন্ধু।

হাসি মুখে তপাই বলল—কি রকম?

—আজ রাতে তুমি এখানে থাকো। কাল সকালে সাধুখাঁদের ভ্যান গাড়ি করে তোমাকে বিহারে পাচার করে দেবো। গাড়িটা তোমাকে ধানবাদ অথবা বরাকরে পৌঁছে দেবে। ওখান থেকে তুমি গয়ার দিকে চলে যেও। গয়া অথবা পাটনার একটা ঠিকানা তোমাকে দেওয়া হবে। সেখানে গেলে ছোট খাটো একটা কাজ এবং আশ্রয় দুই-ই পেয়ে যাবে। পরে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে অন্য ব্যবস্থা করব। খুশি তো?

তপাই বলল – এমন একটা সুখবর। খুশি না হয়ে পারি?

রাত দশটা নাগাদ খাবার ডাক পড়ল। আবার সেই চোর্ব-চুষ্য খাওয়া। কিন্তু এবারে আর কাজলকে ধারে কাছে দেখা গেল না কোথাও। মা-ই খেতে দিলেন। হয়তো কাজল আগে ভাগে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তা-ই কী! তপাই তো মনস্থির করেই ফেলেছে। তবু আর একার দু'চোখ ভরে ওকে দেখবার খুব ইচ্ছে হল ওর। মেয়েটি বড় ভালো।

www.arisumu.com

সপ্তম অধ্যায়

খেয়ে দেয়ে বিছানায় এসে শুলেও তপাইয়ের চোখে ঘুম কিন্তু এলো না। ও কেবলই চেষ্টা করতে লাগল নিঃশব্দে এখান থেকে কেটে পড়বার। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর বাথরুম যাবার আছিলায় তপাই দরজা খুলে চুপি চুপি বেরলো একবার। দালানে এসে বুঝল সবাই এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি।

পাশের ঘর থেকে কাজলের বাবার গলা শোনা গেল—দেখ বুবাই! এত তাড়াতাড়ি খুব বেশি কাউকে বিশ্বাস করাটা ঠিক হচ্ছে না। কে যে কোন ছলে আসে তা কি কেউ জানে?

—কিন্তু বাবা, ও তো নিজে থেকে আসেনি। আমিই নিয়ে এসেছি ওকে।

—ঠিক করোনি। আর কখনো এমন কাজ কোর না। কথায় আছে "অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসো দেয়ঃ ন কস্যচিদ্" তাছাড়া এই পথে একবার যারা আসে তারা কখনো ভালো হয় না। ভালো হবার মানসিকতা যাদের থাকে তারা এ পথে আসে না।

—তবে আমার মনে হয় এ ছেলেটি··।

তপাই আর কিছু শুনল না। শোনবার প্রয়োজনও মনে করল না। ঠিক। বিপথগামী ছেলেকে কেউ বিশ্বাস করে না। তবে আর কেনই বা মিথ্যে মায়ায় পড়ে থাকা? ওর এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। আর একটু রাত্রি হোক। ও পাড়ি দেবে নিরুদ্দেশের পথে। চায়ের দোকানে বাঁকাদার হত্যাকারীর কাছ থেকে একটা রিভলবার উদ্ধার করেছে ও। সেটিকে সঙ্গে নিয়েই ও মিশে যাবে অন্ধকারে। হারিয়ে যাবে চিরতরে।

আবার ঘরে এসে অন্তহীন প্রতীক্ষা। তারপর যখন চারিদিক নিশুতি হয়ে গেল তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

আস্তে আস্তে দালান পার হয়ে আলতো করে দরজার খিল খুলে রাস্তায় নামল।

এইভাবে আসাটা হয়তো ওর ঠিক হল না। তবু উপায়ও নেই। হঠাৎ যদি বাড়িতে কোন চুরি ডাকাতি হয় তাহলে নিশ্চয়ই ওরা ওকে ভুল বুঝবে। ভাববে অজ্ঞাতকুলশীলকে ঘরে থাকতে দিয়েই এই কাল হল। দুঃখ পাবে কাজল। ভুল বুঝবে ওকে। একটা যে চিঠি লিখে যাবে সে উপায়ও নেই। ও কিছু সময় কীংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হন হন করে এগিয়ে চলল অন্ধকার পথ ধরে। একটু হেঁটে আসার পরই জঙ্গলে এসে পড়ল। এখানকার পথ ঘাট কিছুই তো চেনে না। যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে যাবার জন্যই পা দুটোকে এগিয়ে দিল। খানিক আসার পরই ওর মনে হল শুকনো পাতা মাড়িয়ে কেউ যেন ওকে অনুসরণ করছে। ও যখনই থামে সেই পদ শব্দও থেমে যায়। ও চললেই আবার শুরু হয় পথ চলা। এইভাবে যেতে যেতে হঠাৎ একসময় থমকে ঘুরে দাঁড়াল তপাই। ডান হাতে তখন শোভা পাচ্ছে সেই উদ্যত রিভলভার। ওর মনে হল থেমে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ যেন চকিতে লুকিয়ে পড়ল একটি গাছের আড়ালে।

তপাই বলল—কে তুমি! সাহস থাকলে আমার সামনে এসো।

কোন সাড়া নেই। শব্দ নেই।

—চুপ করে আছো কেন? উত্তর দাও। এগিয়ে এসো আমার সামনে।

এতক্ষণে কাজ হল। এগিয়েই এলো সে। ধীর পায়ে ভয়ে ভয়ে।

তপাই বলল—কে তুমি!

—ভালো করে তাকিয়ে দেখো। তাহলেই চিনতে পারবে।

তপাইয়ের কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে এলো। হাত থেকে খসে পড়ার উপক্রম হল রিভলভারটা। তবু বিস্ময়ভরা গলায় বলল—

কাজল!

—তুমি এমন চোরের মতো পালিয়ে এলে কেন?

—তোমার ভালোর জন্যে। কিন্তু তুমি এখানে কেন?

—তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো বলে।

—আমি অজ্ঞাতকুলশীল। আমাকে বিশ্বাস কোর না। আমাকে যেতে দাও। ফিরে যাও তুমি।

—আমি তো ফিরে যাবো বলে আসিনি।

—কিন্তু কাজল, আমাদের এখনো সে বয়স হয়নি। আমার হাতে পড়লে তোমার দুর্গতির শেষ থাকবে না।

কাজল বলল—আমার ভাবনা পরে ভাববে। আমি জানি কোন ভুল আমি করছি না। যতদিন না তুমি কিছু একটা করো ততদিন আমরা ভাইবোনের মতো থাকব। তারপর যা কপালে আছে তাই হবে। কিছু টাকাও সঙ্গে এনেছি। কয়েকটা দিন চলে যাবে এতে। ভেবেছিলাম সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রিবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করব। কেননা দাদা বাবা তোমাকে সাধুখাঁ-দের মোটর ভ্যানে বিহারে না কোথায় যেন পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি সজাগ ছিলাম। এমন সময় দেখি তুমিই চলে যাচ্ছো চুপি চুপি। তাই তোমার পিছু না নিয়ে পারলাম না।

তপাই বলল—তুমি আমার পাশে থাকলে আমি অত্যন্ত খুশি হবো কাজল। কিন্তু আমার পথ তোমার জন্য নয়।

—তোমার যে পথ সে পথ তো হারিয়ে গেছে। এখন তোমাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। আমি তোমাকে আদর্শ ছেলে হিসেবে গড়ে তুলব।

—বুঝলাম। কিন্তু এখনো সময় আছে। তুমি ফিরে যাও।

—না। আর সময় নেই। ঐ দেখো দূরে টর্চের আলো। জঙ্গলে তল্লাসী চালাতে পুলিশ আসছে। ওরা তোমাকে দেখলেই ধরবে। এসো আমার হাত ধরো। আমি তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবো। আমি এখানকার মেয়ে। সব আমি চিনি।

—কাজল !

—দেরী কোর না। ধরো হাত।

তপাই ওর হাত ধরল। দুজনে হাতে হাত রেখে সেই অন্ধকার বন পথে ছুটে চলল অনির্দিষ্ট পথে। আঁকা বাঁকা উঁচু নীচু অনেক বন্ধুর পথ পার হয়ে ওরা এসে এমন এক জায়গায় পেঁছিল যেখানে ওরা অনেকটা নিরাপদ মনে করল নিজেদের। এখানে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত ধানকাটা মাঠ আর তারই বুক চিরে পিচ ঢালা পথ। ওরা রাস্তার ধারে একটি গাছের অন্ধকার ছায়াতলে চুপ চাপ বসে রইল। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বহুদূরে একটি লরী অথবা বাসের জোরালো সার্চ লাইটের আলো দেখতে পেল ওরা। তপাইকে বসিয়ে রেখে কাজল নিজেই রাস্তায় নেমে হাত দেখিয়ে থামাল গাড়িটাকে। গভীর রাতে রাজপথে অল্পবয়সী এক কিশোরীকে এই অবস্থায় দেখলে যে কেউ গাড়ি থামাবেই। এ গাড়িও থামল। ভাগ্যক্রমে এটি ছিল দূর পাল্লার একটি বাস। ফারাক্কায় যাবে। বাস থামলে কাজল বাসের কনডাক্টারকে মিথ্যা একটা কাল্পনিক কাহিনী শুনিয়ে নিজেদের ঘোর বিপদের কথা বলে তপাইকে নিয়ে উঠে পড়ল সেই বাসে।

পরদিন সকালে যখন ফারাক্কায় বাস থেকে নামল তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তবুও পুলিশ এবং অন্য লোকে যাতে ওদের সন্দেহ না করে, বিশেষ করে তপাইকে অন্যরকম না ভাবে সেইজন্যে সকলের কাছেই রটিয়ে দিল, বাবা মার অমতে ওরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে এবং কোথাও একটু আশ্রয় বা কাজের সন্ধান পেলে ওরা বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করতে পারে। এই রটনার ফলে সবাই ওদের অন্য চোখে দেখতে লাগল। তপাইয়ের দিক থেকেও হিংস্র রাজনীতির সন্দেহের মেঘটা কেটে গেল। ও যে একজন খুনি আসামী, ও যে পলাতক, একজন প্রথম শ্রেণীর বাস্তু ঘুঘু সে কথা চিন্তাও করল না কেউ। সবাই ভাবল অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের ভেতর আজকাল তো একম হামেশাই

হচ্ছে এও ঠিক সেই রকম।

যাই হোক, কথায় আছে যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। এক্ষেত্রেও তাই হল। এক অবাঙালি ভদ্রলোক সব শুনে দয়া পরবশ হয়ে বললেন—শুনো ! তুম দোনোনে ইয়ে কাম আচ্ছা নেহি কিয়া। ঘর সে নিকালনা ঠিক নেহি।

তপাই মিথ্যে করে বলল—সে জানি। কিন্তু কি করব শেঠজী ! এই মেয়েটা বড্ড গরীব। ওর কেউ নেই। লোকের বাড়িতে বাসন মাজে। পাড়ার ছেলেরা বিরক্ত করে। অথচ মেয়েটা খুব ভালো, তাই আমি বিয়ে করতে চাই ওকে। কিন্তু আমার মা-বাবা রাজি নন। এই অবস্থায় পালিয়ে না আসা ছাড়া উপায় কি বলুন ?

শেঠজী বললেন—তো ঠিক হ্যায়। তুম এক কাম করো। হামারা চিঠ্‌টি লে কর ভাগলপুর চলা যাও। হুঁয়া হামারা এক আদমি হ্যায়। উধার এক-দো মাহিনাকে লিয়ে রুমভী মিলে গা। ও আদমি নাথনগর জুটমিলমে ক্যাণ্টিন বয় কা এক নোকরি দেগা তুমকো। তিন চারশো রুপিয়া তনখা মিলে গা, যাও। লেকিন আভি তুম দোনা সাদী করো। নেহি তো আদমি বুরা সমঝে গা।

ব্যস। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তপাই কাজলকে নিয়ে সেইদিনই চলে এলো ভাগলপুরে। তারপর শেঠজীর চিঠি নিয়ে যথাস্থানে দেখা করতেই থাকার জায়গা এবং সেই সঙ্গে নাথনগরে ক্যানটিন বয়ের চাকরিটাও পেয়ে গেল।

ভাগলপুরের পাশেই সুলতান গঞ্জ। শেঠজীর সেই ভদ্রলোক চিঠিতে সব কিছু জেনেছিলেন। তাই বন্ধু বান্ধব নিয়ে সস্ত্রীক তপাই ও কাজলের বিয়ে দিলেন গৈবীনাথের মন্দিরে। মাসখানেক থাকবার পর তপাই কাজলকে নিয়ে চলে এলো নাথনগরে। কিন্তু এলে কী হবে। চিরকাল যে লোককে রক্তচক্ষু দেখিয়ে এসেছে অন্যের চোখ রাঙানি সেই বা সহ্য করবে কেন ? ক্যাণ্টিনমালিকের সঙ্গে একদিনের সামান্য একটা কথার বচসায় মেরে ধরে একশা করে

চাকরি ছেড়ে চলে এলো তপাই। এরপর কিছুদিন জামালপুরের কাছে কালীপাহাড়িতে এক টিম্বার মার্চেন্টের ঠিকাদারের সঙ্গেও কাজ করল। সে কাজও বেশিদিন করতে পারল না। তবে এইখানে থাকতে থাকতেই ড্রাইভারি শিখে লাইসেন্স বার করে চলে এলো বারহারোয়ায়। গঙ্গার ধারে একটা কলোনিতে ঘর ভাড়া নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করল। বেশ একটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলো তপাই। বাঁধা কোন কাজ কর্ম না পেলেও যখন যেমন পারে তেমনি করে। মাঝে মধ্যে সুলতানগঞ্জে আসে গৈবীনাথের পুজো দিতে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো।

মুঙ্গের থেকে কামালপাশা নামে এক দুর্বৃত্ত তার দুই সাগরেদকে নিয়ে এসে হাজির হল ওদের এলাকায়। এদের মধ্যে একজনের নাম ঈশা খাঁ আর একজনের নাম কাল্লে খাঁ। যেমন ভয়ানক দেখতে তাদের, তেমনি হিংস্র প্রকৃতি। এরা এসে ওদের সেই শান্ত পল্লীটিকে অশান্ত করে তুলল। সারা এলাকা জুড়ে মার-পিট খুন-জখম এমন শুরু করল যে সৎ এবং ভদ্র মানুষের টেকা দায় হয়ে উঠল।

তপাইয়ের রক্তের বারুদে আবার জ্বলে উঠল আগুন। মগ্ন মৈনাক জেগে উঠল আবার। ও শুধু সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। ও বুঝল আবার লড়াই করতে হবে। তবে এবারে আর নীরিহ শান্তি কামী মানুষের সঙ্গে নয়। তাদের হিতার্থে কিছু দুষ্কৃতির সঙ্গে। এই তার শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হয় সে বাঁচবে, নয় তো শেষ হয়ে যাবে চিরতরে। কেননা ওরা তিনজন ও একা।

কামালপাশার দল প্রথমে ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় করত। তারপর লুঠপাট। চুরি ছিনতাই রাহাজানি। যখন দেখল বস্তির লোকগুলো নির্বিবাদে সব কিছুই মেনে নিচ্ছে তখন ওরা আরো এক ধাপ এগিয়ে এলো।

ওদের কলোনিতে প্রভুদয়াল নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। সবাই তাঁকে দয়ালদা বলে ডাকত। বেশ ধার্মিক এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। সেই দয়ালদার একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী। ওর নাম ছিল সুরভী। পীরপৈঁতি নামে সুলতানগঞ্জের কাছে একটি জায়গা আছে। সেইখানে মেয়েটির বিয়ের সব ঠিক-ঠাক। বিয়ের আগের দিন কামালপাশার চিঠি নিয়ে ঈশা খাঁ আর কাল্লে খাঁ এসে হাজির। সে এক সর্বনাশা চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিল "মেয়ের বিয়ের জন্যে সংগ্রহ করা সমস্ত টাকা এবং সোনার গহনা সব যেন কামালপাশার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং কামালপাশার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই বস্তির কোন মেয়ের যেন বিয়ের চেষ্টা না করা হয়।

চিঠি পেয়েই তো মাথায় হাত। সস্ত্রীক দয়ালদা ঈশা খাঁ ও কাল্লে খাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কোন লাভ হল না। ওরা একটু ভেবে দেখার সময় দিয়ে চলে গেল।

সারা বস্তি জুড়ে শোক ও অশান্তির ছায়া নেমে এলো। নীরিহ মানুষগুলো প্রতিবাদ করতে রুখে দাঁড়াল না কেউ।

রাত্রিবেলা গাড়ি গ্যারেজে রেখে তপাই এসে যে মুহূর্তে এই কথা শুনল অমনি আবার গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠল ওর। কাজল ওর জন্য মাছের ঝোল আর ভাত রেঁধে রেখেছিল, তা আর মুখে দেবার সময় পেল না। কারণ গলির মুখে তখন দারুণ হৈ হট্টগোল। কী ব্যাপার? না, এই মাত্র ওরা এসে সুরভীকে নিয়ে গেল।

তপাই একটুও দেরি না করে ওর গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখা সেই রিভলভারটা বার করে কাজলকে বলল—দরজা বন্ধ করে শুয়ে থেকো। যদি না ফিরি চিন্তা কোর না।

কাজল শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ওকে। বলল—না। এ কাজের জন্যে তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না। ঐ সর্বনাশা জিনিসটা তোমার হাতে উঠলে আবার তুমি আগের মতো হয়ে

যাবে। তাছাড়া ওরা তিনজন। তুমি একা। ওদের সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে না।

তপাই বলল—আমাকে বাধা দিও না কাজল। এই যদি আমার নিয়তি হয়, তাহলে তাকে তুমি খণ্ডাতে পারবে না। বাবা গৈবীনাথের কসম। ওদের তিনটেকেই আমি শেষ করব।

—না। আমার কসম ও কাজ তুমি করতে পারবে না।

তপাই বলল—কাজল, এমনও তো হতে পারে আজ ওরা সুরভীকে নিয়ে গেল। কিন্তু কাল তোমাকে নিয়ে যাবে।

কাজল শিউরে উঠল। বলল—ন্ না।

—তাহলে? এ জীবনে আমার আর ভালো হওয়া হল না। দেখি, এবার অন্যের ভালোর জন্যে যদি আমি আরো খারাপ হতে পারি।

কাজল আর বাধা দিল না।

তপাই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দয়ালদার ঘরে গিয়ে দেখল স্থাণুর মতো উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে বসে আছেন দয়ালদা। পাশেই মেয়ের শোকে আছাড় কাছাড় করছেন তাঁর স্ত্রী। আর বস্তি শুদ্ধু মেয়ে পুরুষ সবাই জড় হয়ে তাঁদের সান্তনা দিচ্ছেন এবং উপদেশ দিচ্ছেন ভবিতব্যকে মেনে নেবার।

ক্রুদ্ধ সাপের চোখে তাকিয়ে তপাই যখন দয়ালদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন তাকে দেখলে যমেও শিউরে উঠত বুঝি।

দয়ালদার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল ওকে দেখে—আমার সুরভীকে ওরা নিয়ে গেল। কিন্তু এই এতগুলো মানুষ এখানে ভীড় করে আছে কেউ বাধা দিতে পারল না ভাই।

তপাই বলল—কতক্ষণ আগে এসেছিল ওরা?

দশ—মিনিটও হয়নি।

দরজার কাছে এক মধ্যবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছিলেন। তপাই জিজ্ঞেস করল তাঁকে—গুল্টু কাঁহা হ্যায়

মৌসী?

—ও বাহার খাড়ি হ্যায়।

বাহার খাড়ি হ্যায় মানে গলির মোড়ে। তপাই হন্তদন্ত হয়ে

www.arisumu.com

তুমি আমাকে বাধা দিও না কাজল

গুল্টুর কাছে গিয়ে বলল—ক্যা তামাশা দেখতে রহে দোস্ত?

গুল্টু বলল—আরে ভাই শুনা? সুরভীকো লে কর ভাগা বেটা

বদমাশ কা বাচ্চা।

তপাই বলল—শুনেছি। লেকিন তেরা মায়ী ক্যা বহিন কো কোঈ দিন কিসিনে উঠাকে লে যায় তো? তব ভি অ্যায়সা মাফিক তামাশা দেখেগা?

বিস্মিত গুলটু বলল—কভী নেহি। হাম উসকো জিন্দা নেহি ছোড়ুঙ্গা।

—তো আভি যাকে তেরা মোটর বাইক তুরন্ত লে আয়।

—যাতে হেঁ। লেকিন ও বহুৎ খতরনক হ্যায়।

—আজ মালুম হোগা কি উসসে ভি জায়দা খতরনক আভি জিন্দা হায়। যা দের মাৎ কর। জলদি আ যা।

গুলটু চোখের পলকে ছুটে গিয়ে ওর মোটর বাইকটা নিয়ে এলো।

তপাই বলল—ও লোগ্ কিধার গিয়া মালুম হ্যায় কুছ?

—গড় কালীকা মন্দির মে গিয়া হোগা জরুর।

গুলটুকে পিছনে বসিয়ে তপাই 'জয় বাবা কি' বলে বিপজ্জনক-ভাবে বাইকটাকে ছুটিয়ে দিল।

গুলটুর অনুমানই ঠিক। গঙ্গার ধারে একটা উঁচু ঢিবির ওপর গড় কালীর ভগ্ন মন্দির। সেখানে না আছে দেবতা, না হয় পুজো পাঠ। সন্ধের পর দুষ্ট চক্রের ঘাঁটি বসে সেখানে। সাট্টা জুয়ার আসর বসে। আরো অনেক নোংরা কাজও হয়।

ওরা গড় কালীর মন্দিরের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় একটি গাছের আড়ালে বাইকটাকে রাখল। তারপর চুপি চুপি দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে অন্ধকারে মিশে উঠতে লাগল সেই গড় কালীর মন্দিরে। গুলটু প্রথমে যেতে খুব ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু পরে তপাইয়ের হাতে ঐ ভয়ঙ্কর মারণ যন্ত্রটি দেখে সাহসে বুক বাঁধল।

এ ঘরের দরজাও নেই। জানালাও নেই। তাই ঘরে ঢুকতে বাধাও নেই। ঘরের ভেতর এবং দালানে বাতি জ্বলছে।

হঠাৎ ধুপ করে একটা শব্দ হতেই ঈশা খাঁ আর কাল্লে খাঁ ছুটে এলো—কৌন! কৌন হ্যায়?

তপাই বলল—তেরা দুশমণ।

ঈশা খাঁ কাল্লে খাঁ ভেবে পেল না কে বলল এবং কোথা থেকে বলল কথাটা।

ঈশা খাঁ বলল—তুম যো কোঈ হো মেরা সামনা মে তো আও।

তপাই পিছন দিক থেকে রিভলভারের নলটা ওর ঘাড়ের কাছে ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল। গুড়ুম।

এবার কাল্লে খাঁর পালা। সে এই অন্ধকারে ব্যাপারটা কি হল বুঝতে না পেরে যেই না পালাতে যাবে গুলটু অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর ওর শক্ত আঙুলগুলো দিয়ে গলার নলিটা এতো জোরে টিপে ধরল যে কিছুক্ষণ মুরগীর মতো ছটফট করেই নেতিয়ে পড়ল কাল্লে খাঁ।

তপাই ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর।

ঘরের ভেতর এক কোণে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সুরভী। আর এক পাশে শিকারি বাঘের মতো গোঁফ ফুলিয়ে বসে আছে কামালপাশা।

তপাই ঘরে ঢুকতেই সুরভী ছুটে এলো—তুম ঘর চলা যাও তপাইদাদা। নেহি তো এ শয়তান মেরা বাবুজী মাজীকো মার ডালে গা। তুমকো ভি মারে গা এ লোক।

তপাই বলল—তুম চুপ রহো বহিন। ইয়ে বদমাশ বহুৎ জ্বালায়া হাম সবকো। আজ ইসকা টায়ার হাম পাংচার করকে তব যায়েগা।

উন্মত্ত কামালপাশা তখন রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দাঁড়ালে কি হবে। সে তখন নিরস্ত্র। দিনের পর দিন বাধা না পেয়ে সদা সতর্ক থাকতে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল সে। তাই তপাইয়ের হাতে উদ্যত রিভলভার দেখে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠল—ঈশা খাঁ! কাল্লে খাঁ! জলদি আ যাও।

তপাই বলল—ওদের মরা বাবাও আর আসছে না ব্রাদার। একটু

আগেই তো একটা গুলি খরচা করলাম তোমার সাগরেদের জন্যে। শুনতে পেলে না ?

কামালপাশা ভয়ে ঘাড় নাড়ল—না।

ততক্ষণে গুলটুও এসে দাঁড়িয়েছে।

কামাল বলল—মুঝে মাৎ মারো। ম্যায় মাফি মাংতি হুঁ। আভি হাম হিঁয়াসে বহৎ দূর চলা যায়েগা।

তপাই বলল—হাঁ। যানাহি হোগা বহৎ দূর। লেকিন উইদাউট টিকট মে মাৎ যাও।

—ও টিকট কাঁহা মিলে গা ?

—ইধার।

—তপাই একটুও সময় নষ্ট না করে আর একটা গুলি খরচা করল। গুড়ুম। কিছুক্ষণের ছটফটানি। তারপরেই সব শেষ।

কাছেই গঙ্গা। গড়ের ওপর থেকে গঙ্গার জলে তিনটে লাসকে ফেলে দিতে সময় লাগল না একটুও।

সুরভী 'দাদা' বলে বলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তপাইকে। এরপরে ঐ মোটর বাইকে চেপেই তিনজনে ফিরে এলো বস্তিতে।

দয়ালদা এবং তাঁর স্ত্রী অক্ষত শরীরে মেয়েকে ফিরে পেয়ে কী যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

কাজলও খুশি হল তপাই ফিরে আসায়। তপাইকে প্রণাম করে সে বলল—আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখবে ?

—বলো ?

—কাল সকালেই ঐ রিভলভারটাকে তুমি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এসো।

—সেকি !

—হ্যাঁ। আমার কথা শোনো। ভালো হবে। কেননা ঐ জিনিসটা যতদিন তোমার হাতের কাছে থাকবে ততদিন তোমার ভেতর থেকে খুনের নেশাটা যাবে না। এবং বিপদও হঠাৎ করেই আসবে।

এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই যা হবার তা হয়েছিল। অর্থাৎ গুলটু ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে যাওয়ায় খুনের ঘটনাটা যেমন জানাজানি হয়নি তেমনি থানা পুলিশের ঝামেলাও পোহাতে হয়নি কাউকে। তবে দুঃখের বিষয় সুরভীর বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল। তা যাক, বাবা মায়ের বুকে তাদের হারানিধি যে ফিরে এসেছিল এটাই যথেষ্ট। ওর বাবা দয়ালদা এই ঘটনার পর মেয়েকে নিয়ে এখানকার পাট চুকিয়ে বেগুসরাইতে তাঁদের দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। এবং সেই থেকে ঐ কলোনীর মধ্যে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

এরপর সুখে দুঃখে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ওদের সুখী গৃহকোণ আলো করে এক সুন্দর শিশু জন্ম নিল। তপাই এখন ঘোর সংসারী। তবে ঠিক মতো কাজ কর্ম না থাকায় আর্থিক অনটন লেগেই থাকে প্রায়। গাড়ি যখন চলে তখন বেশ রমরমা। আর গাড়ি বসে গেলেই অবস্থা যা কে তাই। এর ওপর রোগ নাড়া ঢুকলে তো কথাই নেই। তবে শত দুঃখেও তপাই আর কোনরকম খারাপ কাজ করে না। কেননা ও জেনেই গেছে অসৎ উপায়ে উপার্জন করার অর্থই হচ্ছে যত অনর্থের মূল। কিন্তু সৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থে সংকুলান না হলেও শান্তি এবং মুক্তির পথ।

এই পর্যন্ত বলে তপাই থামল।

আমি গঙ্গার ওপারে গৈবীনাথের মন্দিরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম—ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাগ্যিস নাটকীয়ভাবে তোর সঙ্গে আমার দেখা হল। তাই তো এত সব জানতে পারলাম। তোর ভেতরে যে হিংস্র পশুটি জন্মেছিল সে এখন মরে গেছে। কাজলের সংস্পর্শ এবং ভগবানের অগ্নি পরীক্ষায় তুই এখন অগ্নিশুদ্ধ। তোর জীবনের যত কিছু অন্যায় অপরাধ সবের মুক্তিস্নান হয়েছে সেদিন, যেদিন থেকে তুই রুখে দাঁড়াতে শিখেছিস। তোর প্রথম মুক্তি হয়েছে কৃষ্ণনগরে বঙ্কাদার

হত্যাকারীকে হত্যা করে। তাই তুই ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবে না চাইতেই পেয়ে গেছিস কাজলের মতো সদ্‌বংশজাত একটি মেয়েকে। ওকে না পেলে তুই হয়তো আরো ভেসে যেতিস। আর তোর চিরমুক্তি হয়েছে সুরভীকে ওর মা-বাবার বুকে যেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিস সেদিন। তাই তো খুশি হয়ে ভগবান এক চাঁদের মতো ফুটফুটে শিশুকে উপহার দিয়েছেন তোদের কোলে। দেবতার আশীর্বাদে ওর জন্ম। আমি ওর নাম রাখব দেবাশিস। আর এও জেনে রাখিস এই যে পতিত পাবনি মা গঙ্গা, ঐ যে বাবা গৈবীনাথ। এই পুণ্য তীর্থে এসে এবং পুণ্যসলিলে স্নান করে সর্বপাপ তাপহর হয়ে তুই এখন শুচিশুদ্ধ। তোর পুনর্জন্ম হয়েছে তপাই। ঘরে ফেরার এই তো শুভক্ষণ। নাহলে কি এইভাবে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবার কথা? এখন তোর একটি মাত্র কাজ বাকি। সেটি হল মায়ের চোখের জল মোছানো।

তপাই বলল—কিন্তু মামা, এতদিন বাদে দেশে ফিরব। তাও কপর্দকহীন হয়ে?

আমি হেসে বললাম—তোর ছেলেটা আমাকে বিক্রি করবি? আমি তোকে এক লাখ টাকা দেবো।

—মামা!

—তাহলে? কে বলে তুই কপর্দকহীন? ওরে! বিপ্লব আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছিল কিন্তু বিনিময়ে নিয়ে গেছে আমাদের মনুষ্যত্ব। আর বিপ্লবী হয়ে রীভলভারের নলে গুলি পুরে সেই মনুষ্যত্বকেই আবার তুই ফিরিয়ে আনতে পেরেছিস। আজ তোর চেয়ে বিত্তবান কে? মার্বেল পাথরের একটা বাড়ি আর গোট্টা দুই মারুতি থাকলেই কি মানুষ ধনী হয়? কুঁড়ে ঘরে থেকে মাটির প্রদীপ জেলে যে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেই হচ্ছে সত্যিকারের ধনী। তুই তোর মায়ের কাছে ফিরে যা। কাজলকে নিয়ে যা তার বাবা মায়ের স্নেহ নীড়ে। ঐ দেখ, বেলা বয়ে যায়। পাখিরা নীড়ে ফেরে কত গান গেয়ে। গৈবীনাথের

শেষ খেয়া ধীরে ধীরে এপারে আসে। আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ঐ শোন মন্দিরেতে বাজে। নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। তপাই! প্রকৃতিস্থ হ।

তপাই নিরুত্তর। অনেকক্ষণ নিরুত্তর থেকে এক সময় বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন মামা। এইখানে এইভাবে পড়ে থাকলে ছেলেটা মানুষ হবে না। আমি যাবো। কাল সকালেই যাবো আমি।

—সে তো যেতেই হবে। সকালই তো যাবার সময়। অন্ধকার যতই গাঢ় হোক সকালকে সে ঢেকে রাখতে পারে না। কারণ সকালেই যে আলোর প্রকাশ। তোর জীবনের অন্ধকারও কেটে গেছে তাই। কাল সকালে তোরও জীবন প্রভাত শুরু হবে। নতুন দিনের নতুন সূর্য উঠবে নবদিগন্ত উদ্ভাসিত করে। দেখবি যা কিছু অন্ধকার তা সবই পড়ে থাকবে তোর পিছনে। যা কিছু উজ্জ্বল তা উদ্ভাসিত হবে সম্মুখে। কাল থেকেই শুরু হোক তোর আলোকাভিসার। তোর জয় হোক।

আমরা যখন আমাদের কথালাপ শেষ করে ফিরে আসতে যাচ্ছি তখন ছেলেটিকে বুকে নিয়ে ধীর পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে কাজল।

ও কাছে এসে বলল—আপনারা এখানে?

তপাই বলল—আমি তো বলেই ছিলাম আমরা গঙ্গার ধারে থাকব।

—ছেলেটা বড্ড বায়না করছিল। আর ধরে রাখতে পারছিলাম না ওকে।

—আরো আগে আসতে পারতে। মামুর সঙ্গে কত কথা হল।

আমি বললাম—বউমা! কালই আমরা কলকাতায় ফিরব। এখন চলো সবাই মিলে একবার স্টেশনে যাই। ওখানে গিয়ে কখন কোন গাড়ি পাবো না পাবো সব খোঁজ খবর নিয়ে আসি। অমনি একটু চা-টাও খাওয়া যাবে।

আনন্দে কাজলের চোখ দুটো যেন চক চক করে উঠল। বলল—সত্যি!

www.arisumu.com

—সত্যি না তো কি মিথ্যে ? আমি কি অমনি ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম !

কাজলের দু'চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু নামল। বলল—আমি জানতাম আমার তপস্যা কখনো বিফলে যাবে না। আমি কখনো কোন অন্যায় করিনি। অধর্মর আশ্রয় নিই নি। যার জন্যে ঘর ছেড়ে এসেছি সে দুঃখ পাবে বলে ঘরের খবরও রাখিনি কখনো। এমন কি লুকিয়ে একটা চিঠিও দিইনি ওদের।

—কেন মা ?

—আমার যে তপোভঙ্গ হবে। জীবন সাধনায় নিষ্ঠা না হলে কি চলে ? তাই জয় হল আমারই। সব আমি ফিরে গেলাম।

আমি অবাক হয়ে গেলাম কাজলের কথা শুনে। কতই বা বয়স কাজলের ? আজকের দিনেও এমন এক ত্যাগী,যোগী,মহৎপ্রাণা মেয়ে যদি আমাদের দেশে থাকে তাহলে কে বলে যে সে দেশ রসাতলে গেছে ? দেশ হতে দেশান্তরে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যাঁর কৃপাদৃষ্টি তাঁর সৃষ্টি কি রসতলে যাবার ? তাঁর সৃষ্টিতেই, যে মুহূর্তে একজন মরে, সেই মুহূর্তে একজন জন্মায়, এক ফুল ঝরে, এক ফুল ফোটে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত মেঘ রোদ্দুর রাত্রি দিন সবই হয়। তাহলে ?

তপাই ওর ছেলেটাকে কাজলের বুক থেকে নিজের বুকে নিল। তারপর চুমোয় চুমোয় মুখখানি ভরিয়ে দিয়ে বলল—দিদার কাছে যাবি ? কিরে দুষ্টুটা ?

শিশু কি বুঝল কে জানে ? ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

আমি হাত বাড়ালাম। হেসে মুখ সরিয়ে নিল। আমার কাছে এলো না পাজিটা।

গঙ্গার ধার থেকে উঠে আসতেই আমরা আলো ঝলমল রাজপথে এসে পৌঁছলাম। সমস্ত সাজানো গোছানো দোকান পত্তরগুলো আলোয় ঝলমল করছে। আমার কাছে যা টাকা ছিল তাইতে কাজলের জন্য মানান সই শাড়ি কিনলাম একটা। সেই সঙ্গে সাবান

সিঁদুর আলতা। তারপর একসময় এসে পৌঁছলাম স্টেশনে।

কথায় আছে কপাল যখন খোলে তখন দু'হাট হয়েই খোলে। তাই ভাগ্যের চাকাও ঘুরে চলল বন বন করে।

স্টেশনে আসতেই আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি এখানকার এ. এস. এম। বললেন—হাওড়ায় যাবেন ? একটু দাঁড়ান। গাড়ির পজিশন কি জেনে বলছি। বলে আমাদের সকলকে তাঁর অফিসে বসিয়ে টেলিফোন ধরে অনবরত কি সব খটা খট করতে লাগলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বললেন কার সঙ্গে। অনুমানে বুঝলাম জামালপুরের স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। কথোপকথনে বুঝলাম আশার আলো রীতিমতো আছে।

আমি এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর মুখের দিকে।

রিসিভার নামিয়ে তিনি বললেন—আজকের গাড়িতে যদি আপনাদের জন্য তিনটে বার্থের ব্যবস্থা করে দিই তাহলে অসুবিধে নেই তো ?

—কী যে বলেন ? কোন গাড়ি ?

—মুঘলসরাই এক্সপ্রেস। আগে যেটা আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস ছিল। গাড়িটা অবশ্য একটু বেশি রাতে। রাত দুটোয়। যদি কাল যান তাহলে সে ব্যবস্থা হতে পারে। নতুন একটা জামালপুর এক্সপ্রেস চালু হয়েছে, তাতে হয়ে যাবে।

আমি বললাম—ক্ষেপেছেন ? এই বিদেশে অযথা খরচা বাড়িয়ে লাভ কি ? আজ রাতে আমাদের ধর্মশালায় পড়ে থাকাও যা স্টেশনে থাকাও তাই। আপনি আজকের গাড়িতেই করে দিন।

ভদ্রলোক আবার ফোন ধরলেন—হ্যাঁ। সুলতানগঞ্জ বলছি। আপনাদের জামালপুর কোচে যে তিনটে বার্থের কথা বলেছিলুম, সেগুলো ফাঁকা রাখবেন।

ও দিক থেকে কি উত্তর এলো বোঝা গেল না।

…আমার বন্ধুলোক। রিলেটিভের মতোও বলতে পারেন।

কত নম্বর বললেন ?

ওদিক থেকে আবার কি উত্তর এলো।

··এস ওয়ান ? আমি তাহলে টিকিট ইস্যু করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাত দুটো যখন কালকের তারিখই হবে।

টেলিফোন রেখে ভদ্রলোক বললেন—ব্যস। হয়ে গেল। এখন টিকিটটা কেটে নিন। গাড়ীতে যে কোচ অ্যাটেনডেনটস্ আছেন উনি বার্থের চার্জ নিয়ে রসিদ দেবেন। আমি আজ সারারাতই স্টেশনে আছি। কোন অসুবিধে হবে না। তবে এটা একটা ছোট্ট স্টেশন তো। আর দেহাতিদের ভীড় বেশি। তাই ওয়েটিং রুম খুব একটা পরিচ্ছন্ন পাবেন না। আপনারা আমার অফিস ঘরেই বিশ্রাম করবেন।

তপাই বলল—তাহলে মামু, নাইট শো'তে একটা সিনেমা দেখলে কেমন হয় ? সময়টাও কেটে যেত।

ভদ্রলোক বললেন—না না, ঐ কাজটি করবেন না মশাই। ছারপোকার কামড়ে অস্থির হয়ে যাবেন। শরীরের সব রক্ত শুষে নেবে একেবারে। এর চেয়ে চুপ চাপ বসে থাকুন, দেখবেন এমনিই সময় কেটে যাবে।

সিনেমা দেখব বললেই, সিনেমা দেখছে কে ? তার ওপর কাল থেকে রাত জাগো। ঘুমে তখন দু'চোখ লুটিয়ে আসছে। এখন একটু বিশ্রামের দরকার। হাত পা টান করে শুয়ে ঘুম একটা এখুনি চাই। শুধু ঘরে ফেরার টানে এই ভাবে কষ্ট স্বীকার করেও এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

আমরা টিকিট কেটে একটা দোকানে এসে রাতের খাওয়া সেরে নিলাম। গরম গরম রুটি তরকারি রাবড়ি আর প্যাঁড়া। তারপর ধর্মশালায় গিয়ে যা কিছু ছিল সঙ্গে নিয়ে বাচ্চার দুধ ভরে আবার

স্টেশনে চলে এলাম। সকলের হৃদয় থেকে কত কথাই না কুল কুল করে বের হতে লাগল।

কাজল বলল—কতদিন যে মা বাবাকে দেখিনি। দাদার কোন

www.arisumu.com

খবর নেই। মামাবাবু, আপনি আমাদের পৌঁছে দিয়েই আমাদের বাড়িতে একবার চলে যাবেন। বুঝিয়ে বলবেন বাবা মাকে। পারেন তো দাদাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। এতদিনে দাদা বিয়ে করেছে কিনা জানি না। করেছে নিশ্চয়ই।

আমি বললাম—তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না মা। ওখানে পৌঁছেই আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব।

এইভাবেই সময়ের তরী বয়ে চলল।

রাত দুটো। ট্রেন যথাসময়ে এলো। এস. ওয়ান. বগিতে আমরা উঠতেই এ. এস. এম ভদ্রলোক গাড়ির কনডাক্টার গার্ডকে আমাদের কথা বলে উঠিয়ে দিলেন আমাদের। ট্রেন ছাড়ল। মাত্র দু'মিনিট স্টপেজ। তাই থেমেই ছাড়ল ট্রেন।

আমরা যে যার বার্থে শুয়ে পড়লাম। শোয়া মাত্রই ঘুম। সেই ঘুম ভাঙল বোলপুরে এসে। এ গাড়ি হাওড়ায় যাবে না। তাই বর্ধমানে নেমে গাড়ি বদল করলাম। কর্ড লাইনের লোক্যাল ট্রেনে একেবারে হাওড়ায়। ট্রেন থেকে নেমে তপাই বলল—এ যে একেবারে ভোল পাল্টে গেছে মামা। হাওড়া স্টেশনের এত উন্নতি হয়েছে ? চেনাই যাচ্ছে না যে !

আমি ওকে বললাম—তুই বউমাকে নিয়ে একটু দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি। বলেই চট করে রামরাজাতলার তিনটে টিকিট কেটে ওদের বললাম—চল, বারো নম্বরে পাঁশকুড়া লোক্যাল দাঁড়িয়ে আছে। উঠে পড়।

তপাই অবাক হয়ে বলল—কোথায় যাবেন ?

—কেন ? আমার ওখানে।

—সে তো জানি। কিন্তু ট্রেনে উঠব কেন ?

আমি বললাম—ওঃ হো। তোকে তো বলাই হয়নি। এখন আর আমি মধ্য হাওড়ায় নেই। রামরাজাতলা স্টেশনের কাছে ছোট্ট একটা বাড়ি করেছি।

—বলেন কি ? দিদিমা ! দিদিমা কেমন আছে ?

—ভালো আছে।

—আর কোন খবর আছে ?

—তোর মামী হয়েছে। আমি তিন কন্যার পিতা হয়েছি। আর কি জানতে চাস বল ?

তপাইয়ের সে কী আনন্দ। আনন্দের আবেগে সে যে কী করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। বলল—মামা। এত উত্থান পতন কোন কিছুতেই আমরা তাহলে হারিয়ে যাইনি কি বলুন ?

—হারিয়ে গেলেই হল ? ভগবান বলে একজন আছেন না ?

রামরাজাতলায় এসে পায়ে হেঁটেই বাড়ির কাছাকাছি এলাম। এলাকায় ঢুকতেই খবর পেলাম আজই সকালে দিদি মীনার বাড়ি থেকে এসেছেন আমার এখানে। তাই হঠাৎ চমকে দেবার জন্য তপাইকে গলির মোড়ে দাঁড় করিয়ে কাজল ও ছেলেকে নিয়ে বাড়ি এলাম।

আমাকে এইভাবে ফিরে আসতে দেখে তো যারপর নাই অবাক হয়ে গেল সকলে। তার ওপর এই অল্পবয়সী বউ আর ঐ ফুটফুটে শিশুকে দেখে সবারই চোখে বিস্ময়।

মা বললেন—কী হল তোর বিয়েবাড়ি ?

আমার স্ত্রী মায়া বলল—এরা কারা !

—সব বলছি। আগে মুখ হাত ধুই, ধুয়ে ঠাণ্ডা হই। তবে তো। বলে ছেলেটিকে দিদির কোলে দিয়ে বললাম—বাচ্চাটার খিদে পেয়েছে বোধ হয়। একটু দুধ টুধ খেতে দাও দেখি।

দিদি একেই ছেলেপুলে ভালবাসেন তাই এই শিশুর পরিচয় না পেলেও আদরের অন্ত রইল না তার।

কাজলও টুক-টুক করে প্রণাম করে নিল সকলকে।

আমি ততক্ষণে হাত মুখ ধুয়ে পোষাক পরিবর্তন করে ফেলেছি। কাজলকে বসিয়েছি ঘরের ভেতর।

মায়া বলল—এরা কারা ! চিনলাম না তো ?

—তার আগে বলো এরা এখানে থাকলে তোমার কোন

অসুবিধে হবে কি না ?

—তোমার বাড়ি। তুমি নিয়ে এসে কাউকে রাখলে আমার কিসের অসুবিধে ?

—মনে করো এ এক দুখিনী মেয়ে। আমাদের মেয়ের মতন। স্বামীটা বাউণ্ডুলে। তাই আজ থেকে যদি ও ছেলেকে নিয়ে আমাদের এখানে থাকে তাহলে ?

—থাকুক না। কে আর মানা করছে। বলে মায়া কাজলকে ওর একটা আলাদা শাড়ি পড়তে দিয়ে চা করতে বসল।

আর দিদি সমানে ছেলেটাকে আদর করতে করতে বলতে লাগলেন—কী সুন্দর ছেলেরে। কেমন ননীচোরা গোপালের মতন ফিক ফিক করে হাসছে দেখ ! যেন কত দিনের চেনা। কি নাম ওর ?

বললাম—দেবাশিস।

—আমি বাবু ওর নাম রাখব গোপাল।

আমার তিন মেয়ে তুলতুলি, টুঙ আর বাবুনি তখন ছেলেটাকে কোলে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে।

দিদি বললেন—সত্যি করে বলতো কে ? আমি ঠিক চিনতে পারছি না। নিশ্চয়ই চেনা জানা কেউ। নাহলে একেবারে রাস্তা থেকে কাউকে তুলে আনার পাত্র তুমি নও।

কাজল তখন চোখের ইশারায় আমাকে আর রহস্য না করতে মানা করছে।

আমি বললাম—খুব ভালো করে একবার তুমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো তো চিনতে পারো কিনা ?

দিদি বললেন—আমি সত্যিই চিনতে পারছি নারে।

—আবার দেখো।

—তুই আর হেঁয়ালি করিস না। বল কে ?

—যদি বলি তোমার শংকর আবার তোমার কোলে ফিরে এসেছে ?

দিদি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটাকে আবেগে বুকে জড়িয়ে

www.arisumu.com

বললেন—তার মানে ? তুই হঠাৎ একথা বললি কেন ?

—যা সত্যি তাই তো বললাম।

—এ তাহলে··· ?

—তোমার নাতি। আর এই হল তোমার বউ মা।

দিদি বললেন—সে কোথায় ? সেই হতভাগাটা ? তাকে আনতে পারলি না ? আমার ওপর অভিমান করে সে বোধ হয় আসে নি ?

তপাই তখন দোর গোড়ায়। বলল—তোমার ওপর কখনো অভিমান করতে পারি ? স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি। কিন্তু তোমার এই বেশ কখনো দেখতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মা। বাপি নেই। বড়দা নেই।

আমি বললাম—কে বললে শংকর নেই। তোর এই শিশুটির মধ্য দিয়েই তো তার প্রকাশ ঘটেছে।

দিদির তখন সেকি আনন্দ। দীর্ঘদিন পরে হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে সব দুঃখই ভুলে গেলেন বুঝি। তপাইয়ের ছেলেকে বুকে নিয়ে কী যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। তপাই মাকে দিদিমাকে প্রণাম করে আমাদের সবাইকে প্রণাম করল।

ততক্ষণে চা হয়ে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম—তোমরা এবার ভালো করে একটু রান্না খাওয়ার আয়োজন করো। দু'রাত ভালো করে ঘুমোইনি। আমি পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে আসি বউমার বাড়িতে। সুখবরটা ওদেরও তো জানানো দরকার। তারপর দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধেবেলা খবর দেবো স্বপনকে।

দিদি বললেন—অমনি পাঁজিতে একটা শুভদিন দেখবি। সেইদিন আমি আমার ছেলে বউ নাতিকে নিয়ে কদমতলায় চলে যাব। আমার শূন্য-ঘর আবার পূর্ণ হয়ে উঠবে। খোলা উঠোনে গোপাল আমার ছুটাছুটি করবে। একটা পোস্ট কার্ড নিয়ে আসবি। মীনাকেও একটা চিঠি দেব।

আমাদের বাড়িতে যেন একটা আনন্দের উৎসব লেগে গেল। সবাই জেনে গেল এক দুখিনি মায়ের অশান্ত ছেলে শান্ত হয়ে ফিরে এসেছে।

॥ শেষ ॥

www.arisumu.com

Scanned By Arivirus